# শান্তিপুর : সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস

ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
মেনকা নাথ
১৯ শ্যামচাঁদ রোড, শান্তিপুর, নদীয়া

প্রচ্ছদ
তপন কর

মুদ্রক
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো,
কলিকাতা ৭০০০০৬

## উৎসর্গ

৺ মাম্মী ( যাজ্ঞসেনী দাসী )-র পুণ্যস্মৃতিতে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বাংলাভাষায় আইনচর্চার ধারা
পরাজিত বাঙালী

# ভূমিকা

শান্তিপুর বাংলার একটি বিশিষ্ট জনপদ। এর সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস বাংলার সামগ্রিক সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অঙ্গ। তা সত্ত্বেও শান্তিপুরের কিছু নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতার কিছু কিছু পরিচয় এই গ্রন্থে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে অনেক পুরোধা শান্তিপুর সম্পর্কে অনেক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এরমধ্যে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'শান্তিপুর পরিচয়' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আমার এই গ্রন্থটি ঐ ধারা অনুসরণ না করলেও ঐ আকর-গ্রন্থের প্রতি আমার ঋণ অপরিসীম। এ ভিন্ন অন্যান্য যেসব পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে কোন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার স্বীকৃতি গ্রন্থমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমানের চরম ক্ষয়িষ্ণুতা ও অবক্ষয়ের যুগে শান্তিপুর বাসীর পুরানো ইতিহাস, তাঁদের উদ্যোগ ও সৃজনশীলতা, বেদনা ও অত্যাচারের কথা বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টিগোচর করাই এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সার্থক হই তাহলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

এই গ্রন্থ রচনায় যিনি সর্বাধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন সেই শান্তিপুর সংক্রান্ত তথ্যের পিতামহ-স্বরূপ সুবলচন্দ্র মৈত্র গ্রন্থ আরম্ভ দেখে গেলেও গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে আমার গভীর প্রণতি জানাই। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীতারাপদ সাঁতরা এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য যেভাবে সাহায্য ও উপদেশ দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অন্যান্য যাঁদের সহায়তা পেয়েছি তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। শান্তিপুরে গঙ্গার অবস্থান ও কাঁসা পিতলের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির ছবি এঁকে দিয়ে শ্রী নির্মল কান্তি দাঁ আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেইসঙ্গে শ্রী সুজিত সেন নারদের ছবি, ও শ্রী বরুণ খাঁ হরগৌরীর ছবি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দিয়েছেন। আমি তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রচ্ছদপটে ব্যবহৃত ছবিটি শান্তিপুরের ইংরেজ কুঠির রাস্তায় অবহেলিত একটি প্রতিমূর্তির।

সবশেষে শ্রী অনুপ মাহিন্দর ও শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ যেভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে বইটি সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন তা' সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি আন্তরিকভাবে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

মহালয়া ১৪০৩ | পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

## সূচীপত্র


শান্তিপুরে ইংরেজ কুঠি ও কুঠিয়াল ১
শান্তিপুরের তাঁত শিল্পের একটি পুরানো অধ্যায় ৬
শান্তিপুরের গণ-সংগ্রাম—কোম্পানীর আমলে ১১
শান্তিপুরের কুঠি ও এক ইংরেজ চিত্র শিল্পী ১৪
আদিবাহনের চাকা ১৭
মাদুলি, তাবিজ, আংটির গোপন কথা ১৯
শান্তিপুরের 'দোলো' চিনি ২৩
পটে আঁকা পটেশ্বরী ২৮
চাদর পিতলের কাজ ৩১
সোনার গৌরাঙ্গের কারুকৃতি ৩৫
পিতলের রথ ৪৩
শান্তিপুরের এক বিস্মৃত ব্যবসায়ী ৪৭
পঞ্চাশের মন্বন্তর ও শান্তিপুর ৫২
দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ ও শান্তিপুরের ভূমিকা ৫৬
শান্তিপুরে গান্ধির বিয়ে ৬০
'শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিনভাগে' ৬৪
পাকিস্তানী শান্তিপুর ৬৮
পুরসভার পুরাকথা ৭৩
চৈতন্য-সম্ভব ৭৯
প্রবাদের শান্তিপুর—শান্তিপুরের প্রবাদ ৮৭
অন্ধকারের দিনগুলি ৯৪
বাহির-বিশ্বে শান্তিপুর ৯৮
রসিক শান্তিপুর ১০৬
শাশ্বত শান্তিপুর ১১৩
শান্তিপুরের কয়েকটি স্থান-নাম ১২০
পরিচিত শান্তিপুর ১২৩

"শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন ভাগে"

[ পৃঃ ৬৪

রেনেলের মানচিত্রে শান্তিপুরের অবস্থান

[পৃঃ ৬৪
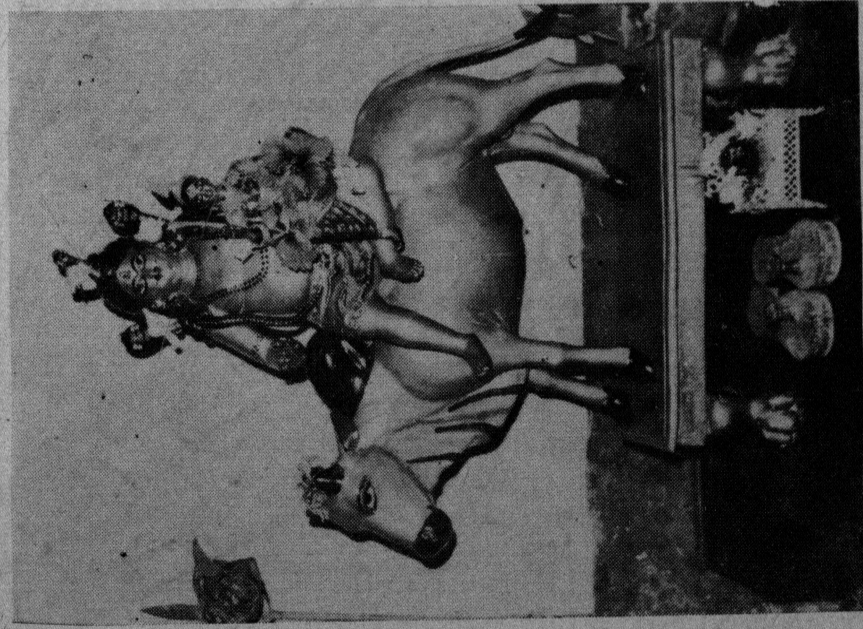
ঢালা পিতলের হরগৌরী

[পৃঃ ৪০
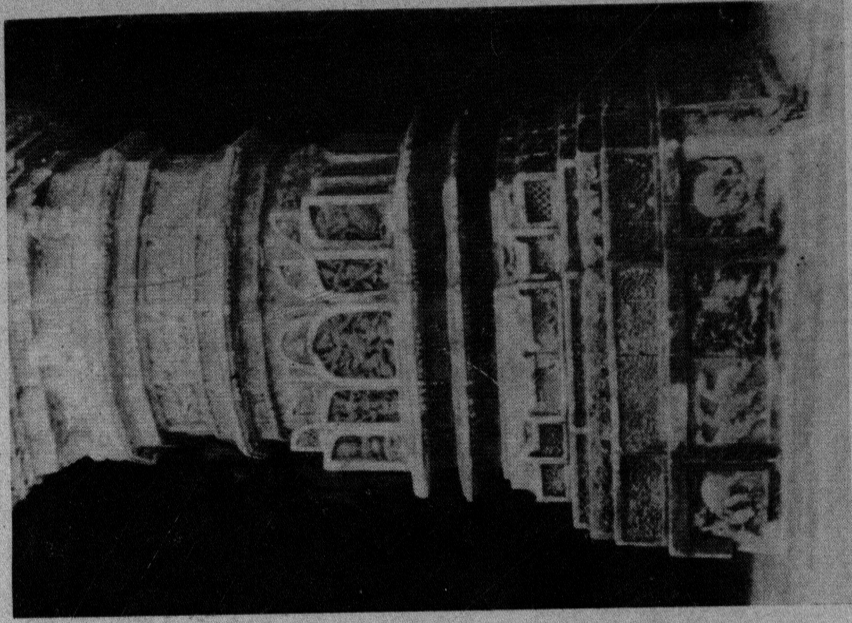
মন্দির স্তম্ভে টেরাকোটা ও পঙ্খের কাজ

[পৃঃ ১২৭
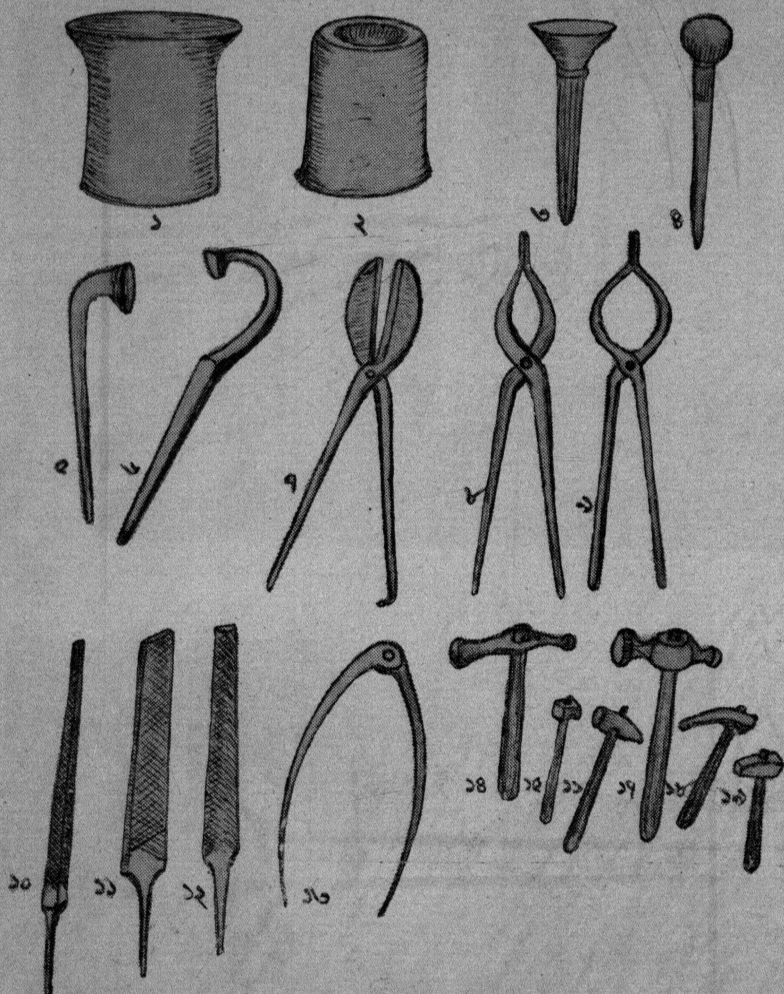
কাঁসা পিতল শিল্পে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি
১-২ নেয়াই, ৩-৬ গজ বা শাবল, ৭ কাতারি, ৮-৯ সাঁড়াশি,
১০-১২ উঁকা, ১৩ কম্পাস, ১৪-১৯ হাতুড়ি

[পৃঃ ৪৩
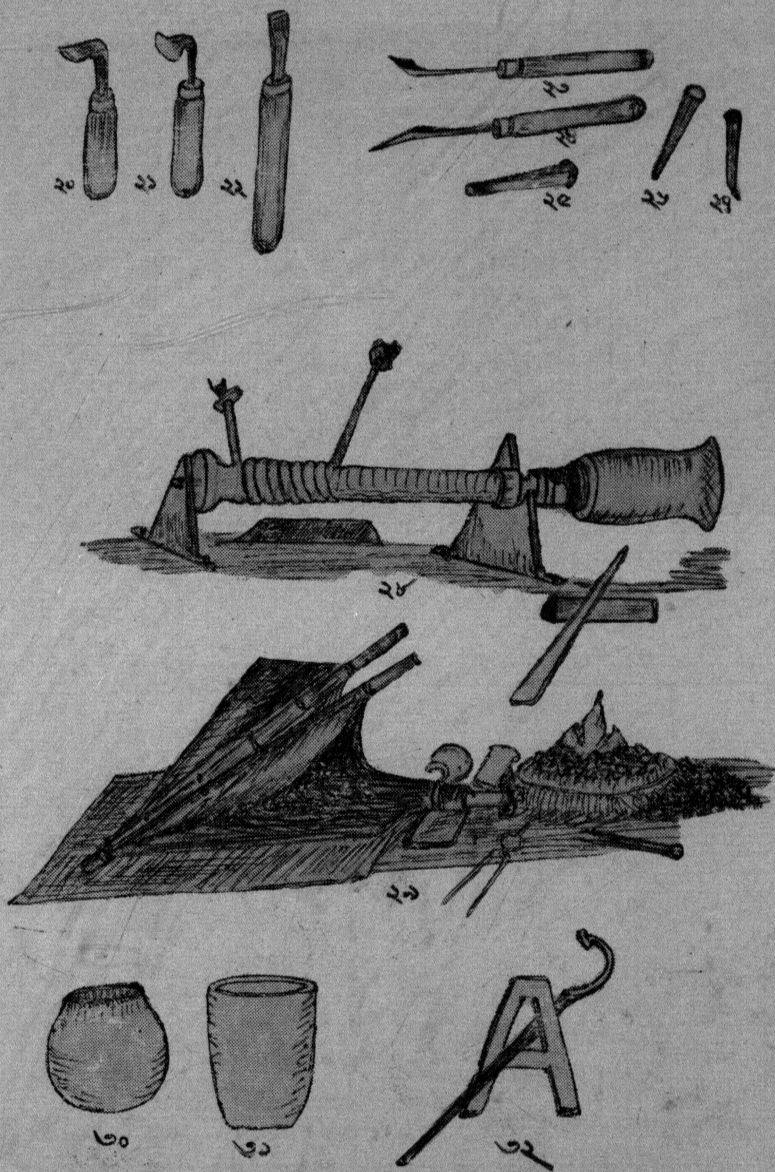
কাঁসা পিতল শিল্পে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি

২০-২৪ নোয়ালি, ২৫-২৭ ছেনী, ২৮ কুঁদ, ২৯ হাপর,

৩০-৩১ মুচি, ৩২ আকন্দকাঠ

[পৃঃ ৪৩

ব্রহ্মাপূজার জলসাধায় ঢেঁকি-বাহন নারদ

[পৃঃ ১০৭
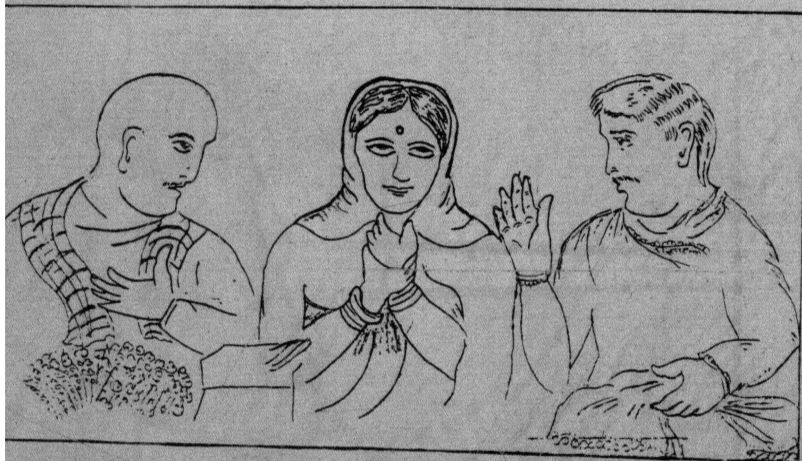
উলা রেলওয়ে শান্তিপুর

"শান্তিপুর ভাবে, এস মম পাশে, দিব মনোমত শাড়ী।
উলা বলে যত, শস্য নানা মত, দিব পুরে গাড়ী গাড়ী ॥"

ব্যঙ্গচিত্র—বসন্তক : ১২৭৯ বঙ্গাব্দ

রেললাইন স্থাপনে শান্তিপুর ও উলার প্রতিযোগিতা

[পৃঃ ১১৪
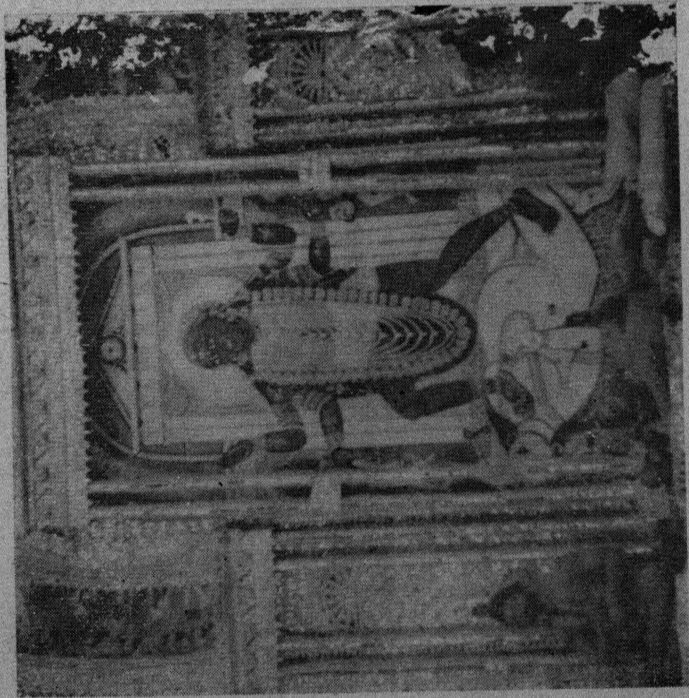
পটে আঁকা পটেশ্বরী

( শ্রী প্রহ্লাদ কুমার মঠের সৌজন্যে প্রাপ্ত )

[ পৃঃ ২৮

'কুম্ভকার বালিকা'

শিল্পী—ললিত মোহন সেন (১৯২৭ খ্রীঃ )

[পৃঃ ১০৪

SANTIPUR DESIYA BHANDAR LD.

*INCORPORATED UNDER ACT VI. OF 1882.*

No. 54 — 20 Shares.

**Capital Rs. 20,000.**

**Divided into 2,000 shares of Rs. 10 each with powers to increase.**

This is to certify that Srijut Kirti Chandra Maitra son of Late Anunda Moy Maitra of Santipur is the holder of Twenty Shares of Rupees ten each numbered 473 to 492 inclusive, in the above named Company, subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association thereof, and upon which calls have been paid as per endorsement.

Given at Santipur under the Common Seal of the said Company this the Second day of October 1906

ESTD. 1900

Directors.

Secretary.

স্বদেশী ভাণ্ডারের রসিদ
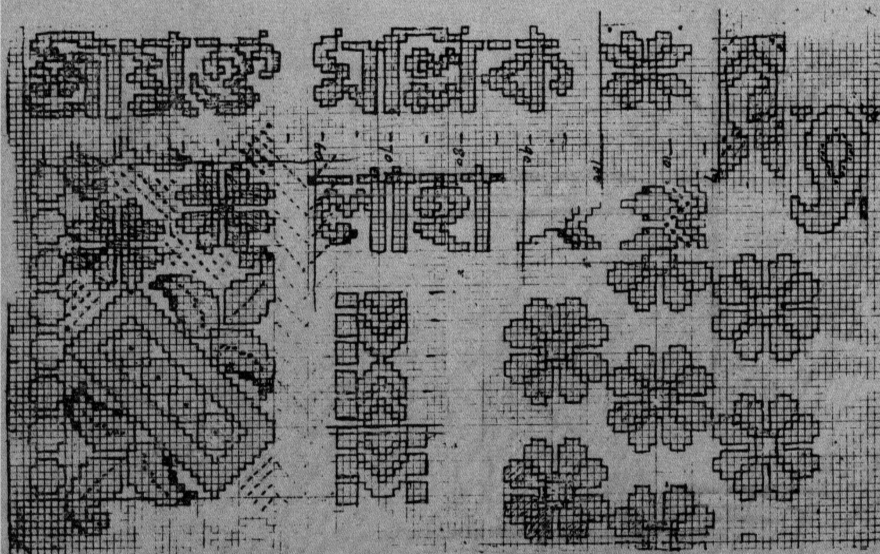
[পৃঃ ১২৪

শাড়ীর পাড়ের একটি খস্‌ড়া নকশা

[পৃঃ ১২৪

বোলান গানের একটি দৃশ্য
( শ্রীইন্দুজ্যোতি কুণ্ডুর সৌজন্যে প্রাপ্ত )
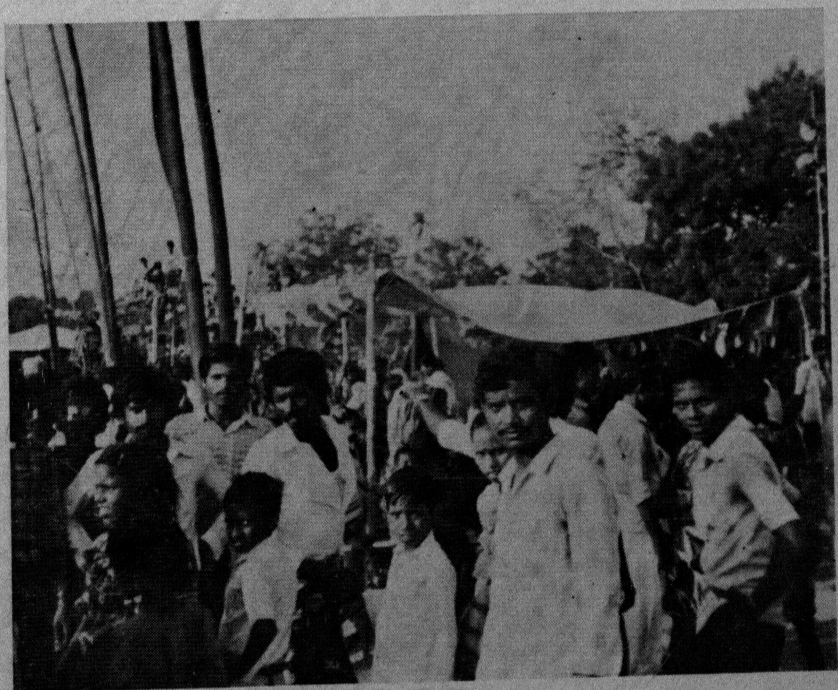
[পৃঃ ১০৬

গাজির বিয়ের মেলা

[পৃঃ ৬০
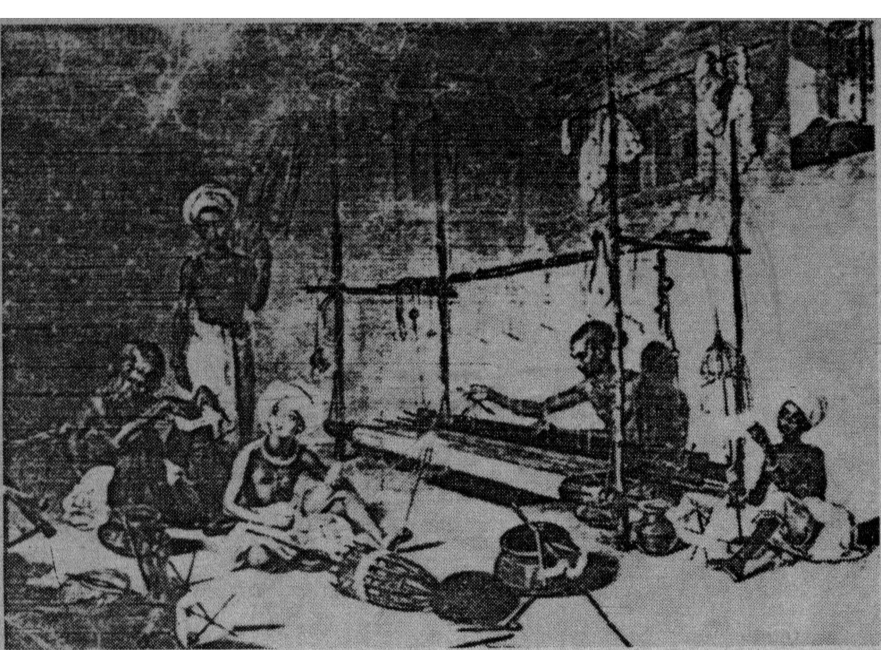
# শান্তিপুরে ইংরেজ কুঠি ও কুঠিয়াল

আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে শান্তিপুরের ইংরেজ কাপড়ের কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ এড্‌ওয়ার্ড ফ্লেচার ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখছেন : 'অতি মিহি ৪০ × ২½ গজ মাপের মলমল মাত্র কয়েকজন তাঁতীই বুনতে পারেন। একমাত্র শান্তিপুরের তাঁতীরাই এটি পারেন। কিন্তু সুতার অভাব হেতু আপনারা যে পরিমাণ ঐ কাপড় চান তা' সরবরাহ করা যাবেনা। তবে ৪০ × ২ ও ৪০ × ২½ গজের সাধারণ মিহি মলমল যদি বলেন ত' এখানকার অবশিষ্ট কিছু তাঁতীকে দিয়ে বুনিয়ে দিতে পারি।' চিঠিটি কোম্পানীর রোজনামচায় ১৭৮৮ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে লিপিবদ্ধ আছে। এই একটি ঘটনায় বোঝা যাবে শান্তিপুরের কাপড়ের ওপর ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নদীয়ায় মোট দুটি কুঠি খুলেছিলেন। একটি কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী কুমারখালিতে। অপরটি শান্তিপুরে। উদ্দেশ্য এখানকার কাপড় সংগ্রহ করে ইউরোপ আমেরিকায় রপ্তানী করা। ব্রিটিশ আমদানীকারীরা এখানকার কাপড়ের ৫ ভাগের ২ ভাগ স্বদেশের বাজারে ছাড়তেন। বাকী ৩ ভাগ ফ্রান্স ও আমেরিকায় চালান করতেন। এ ব্যবসায় তাঁদের লাভও ছিল কল্পনাতীত। ১৮০৫ সালে বাংলা থেকে সারা পৃথিবীতে রপ্তানী হয়েছিল ৬, ৮১, ১৭, ৩৬১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মূল্যের দ্রব্য। তারমধ্যে একা কাপড়ের রপ্তানী মূল্য ছিল ২, ৩০, ৮৩, ৫৭০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ রপ্তানীর ৩৪ শতাংশ শুধু বস্ত্র। বাকী রপ্তানীর অন্যতম প্রধান বস্তু ছিল সোরা।

অন্যান্য কুঠির মত শান্তিপুর প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র হলেও এর অধীনে অনেকগুলি আড়ং বা কাপড় সংগ্রহ কেন্দ্র ছিল। এই আড়ংগুলি হল : শান্তিপুর, সোনাবেড়িয়া, বাগাড়া ( বাগাঁচড়া ), কালীগঞ্জ, দেউলপুর, থলসি, মনোহরগঞ্জ, নির্নিয়া, সাতবয়রা, সেবাতি ও সিদ্ধিপাশা। এই নামগুলি তৎকালীন ইংরেজদের উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিত আছে। তাদের সবগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই দুরূহ।

পলাশীর যুদ্ধের মোটামুটি আগে পর্যন্ত তাঁতী একাই মহাজন, শিল্পী ও বিক্রেতা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের তৈরী কাপড় কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতেন। তাঁদের কাপড়ের উৎকর্ষতাই তাঁদের বাজার পেতে সুবিধা করে দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যবসায়ের জগতে ইংরেজদের তুলনায় দিনেমাররা এগিয়ে ছিল। অনেক তাঁতীই বেশী দাম পেয়ে ফরাসী ও দিনেমার কোম্পানীর প্রতিনিধিদের কাছে মাল বিক্রি করে দিতেন। বছরের

প্রথমে কাউন্সিল টাকা পয়সা, কি ধরনের কাপড় চাই তার নমুনা ও কত পরিমাণ মাল লাগবে তা কুঠির অধ্যক্ষকে জানিয়ে দিতেন। শান্তিপুরে কুঠির কর্মচারী সংখ্যা ছিল গড়ে ২৫ জন। এর মধ্যে প্রধান কুঠিয়াল এবং রপ্তানী গুদামের অধ্যক্ষ ও কয়েকজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন ইংরেজ। বাকী গোমস্তা, মুহুরী, খাজাঞ্চি ও জসনদার (মাল পরীক্ষক ও মূল্যনির্ধারক) স্থানীয় লোক ছিলেন। এ ভিন্ন পিওনরাও শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। গোমস্তার প্রধান দপ্তর 'কাছারী' নামে পরিচিত ছিল। এখানে দালাল, পাইকার ও তাঁতীদের ডেকে পাঠানো হত এবং অজ্ঞ ও গরীব তাঁতীর মতামত ছাড়াই তাকে একটি নির্দিষ্ট দামে তার তৈরী সমস্ত কাপড় ইংরেজদের কুঠিতে সরবরাহ করতে বাধ্য করে 'পাট্টা' ধরিয়ে দেওয়া হত। ১৭৫৭ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় যে কোম্পানী শান্তিপুরে কাপড়ের ব্যবসায়ের স্বার্থে বিনিয়োগ করেছে ১, ৬৮, ৫০০ টাকা। ব্যবসার এইরকম রমরমা অবস্থা দেখে সপারিষদ গভর্ণর ১৭৫৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লিখছেন যে, কোম্পানীর শান্তিপুরের গোমস্তাদের দাদন বা আগাম দিয়ে আমরা খুব ভাল ফল পেয়েছি।

প্রথমে তাঁতীদের কাছ থেকে নগদমূল্যে কাপড় কিনে নেওয়া হত। কিন্তু পাছে তাঁতীরা বেশী দাম পেয়ে অন্যত্র অর্থাৎ ফরাসী বা দিনেমার ব্যবসায়ীদের কাছে কাপড বিক্রি করে দেয় তাই তাদের আগাম দাদন দিয়ে কাপড় ইংরেজ কোম্পানীকেই বিক্রি করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৪৬ সালে এই দাদন প্রথার সৃষ্টি হল। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, শান্তিপুরে কিন্তু ফরাসী বা দিনেমার ব্যবসায়ীরা কোন কুঠি বা ব্যবসায়িক কেন্দ্র করেনি। বিলো নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক কিছু দিনের জন্য ( ১৭৭৫-৭৭ ) এখানে বসবাস করেছিলেন এবং কাপড় কিনেছিলেন। প্রথমে এই দাদন মহাজনের মাধ্যমে দেওয়া হত। পরে ১৭৫৩ সালে স্থির হয় যে, দাদন গোমস্তাই সরাসরি দেবে। এই কারণে গোমস্তার কাছে সমস্ত টাকার দায়িত্ব সরাসরি বর্তায়। কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাজাঞ্চির কাছে সিন্দুকের একটি বিকল্প চাবি রাখা সত্ত্বেও টাকার সমস্ত দায়িত্বই দেওয়ানের। দেওয়ান স্থানীয় অধিবাসী হতেন।

সমসাময়িক কালে শান্তিপুরে তাঁতীদের মজুরীর হার ছিল : সুতাকাটনী দিনে দেড় আনা, সাধারণ কাপড়ের মজুরী দু'আনা, তিন আনা। বুটি ও ফুল তোলা সেরা কাপড়ের মজুরী এগারো আনা। তবে বুটির ফুলের হিসাব ধরা হত আনায় ৭টি করে ফুল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ( ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ ) অনেক তাঁতীও মারা যায়। সুতার দামও খুব বেড়ে যায়। দু'টাকা চার আনা সেরের সুতা হয় তিন টাকা দু'আনা ন'পাই। সরু সুতা চার টাকা ছ'আনা থেকে ছ'টাকা চার আনা। তাই শান্তিপুরের তাঁতীরা ১৭৭১ সালে শতকরা ২৫ ভাগ মজুরী বৃদ্ধি দাবী করে। আবার ভাগদিয়ার ও জসনদাররা ( কাপড় সংগ্রাহক ও মাল

পরীক্ষক তথা মূল্য নির্ধারক ) এই সুযোগে তাঁতীদের পাওনা থেকে দাদনের ওপর টাকা প্রতি ২ পয়সা, দেওয়ানী দস্তুরী বাবদ টাকায় ২ পয়সা ও আরও নানারকম দস্তুরী আদায় করত। তাদের মধ্যে প্রধান হল মালের দাম কমিয়ে আদায় ও ফেন ( ভাতের মাড় ) দস্তুরী নামক দস্তুরী।

১৭৯৮ সালের ৬ই জুলাই ( ১২০৫ সালের আষাঢ় ) শান্তিপুরের ২১ জন তাঁতী জানায় যে, আগাম চুক্তি অনুসারে তারা প্রয়োজনীয় রকমের সুতা যোগাড় করেছে; জসনদার বাড়ী এসে সুতা অনুমোদন করার পর তারা কাপড় বুনতে আরম্ভ করেছে। কোম্পানীর লোক এসে কাপড় নেওয়ার পরে কাপড়ের টানা ও পোড়েনের সুতা গুণে দেখে ওজন করে। এইবার তাদের মতে কাপড় ঠিক হলে রেখে দেয়, না হলে ফেরৎ দেয়। জসনদার, গোমস্তা, নায়েবগোমস্তা ইত্যাদি সামনে থাকে। পরে ঐ রেখে দেওয়া কাপড়গুলি কুঠিয়াল ও অন্যান্যরা মিলে দেখে খারাপ হলে বাতিল ক'রে আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের হাতচিঠিতে ঐসব লিখে দেয়। কিন্তু গোমস্তারা ঐ সুযোগে কুঠিয়ালদের জ্ঞাতসারেই জসনদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাম শতকরা ১৫ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত কম করে লিখে রাখত। পাছে আবার তাঁতীরা অন্যত্র কাপড় বিক্রি করে তাই কোম্পানীর পিওনরা তাঁতীদের ওপর নজর রাখত এবং এক একখানা কাপড় হওয়ামাত্রই কেটে নিয়ে যেত।

১৭৮৩ সালের ২০শে অকটোবর তারিখে শান্তিপুর আড়ঙের অধ্যক্ষ জন প্রিন্সেপ জানালেন যে, শান্তিপুরের কেউ দাদন নিতে চাইছে না। তাঁতীরা অন্যত্র বেশী দাম পাচ্ছে। শান্তিপুরের ১০০ জন ভাল তাঁতীর মধ্যে মাত্র ন'জন পাট্টা নিয়েছে। ১৭০৭ সালের একটি সংবাদে দেখা যায় যে, কোম্পানীর পক্ষে মিঃ ওয়াল নামে একজন কর্মচারী শান্তিপুরের রাস্তায় রাস্তায় টমটম বাজিয়ে ( ঢোল জাতীয় একরকমের বাদ্যযন্ত্র ) তাঁতীদের অন্যত্র কাপড় বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করছে।

ঐ সময়ে কুঠিয়ালরা শান্তিপুরের তাঁতীদের ওপর কি ধরনের শোষণ চালাত তা' নীচের একটি ঘটনা থেকে জানা যাবে। শান্তিপুরে মিহি নয়নসুখ কাপড়ের দাম বাইরে বিক্রি হত সাড়ে উনিশ টাকায়। আর কোম্পানী কিনত বারো টাকায়। অর্থাৎ ৬২'৩ শতাংশ তফাৎ। মলমল ফাইন ন'টাকা বারো আনা বাইরে। কোম্পানী কিনত সাড়ে চার টাকায় অর্থাৎ তফাৎ শতকরা ১১৬.৬৬ ভাগ। খাসা কাপড় বাইরে দু'টাকা এগারো আনা, কোম্পানী দিত দু'টাকা দু'আনা। খাস এলাচী ( সিল্ক ও সুতার মিশ্রণে তৈরী ছোট এলাচের খোসার মত দেখতে ) বস্ত্রের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যবস্থা ছিল। অথচ একটি মলমল তৈরীর খরচ ছিল: টানা ৩৫ তোলা ও পোড়েন ৩৫ তোলা সুতা। টাকায় ১১

তোলা হারে সুতার দাম সাড়ে ছ'টাকা। তাঁতী ও টানাহাঁটার খরচ ১৫ দিনের ( ১৫ × ২ ) দু'টাকা। তাঁতীর মুনাফা টাকায় এক আনা হিসাবে সাড়ে আট টাকায় আট আনা। মোট ন'টাকা। ঐ সময়ে শান্তিপুরে চালের দাম ছিল মণ ( ৮০ সিক্কা তোলা ) এক টাকা দেড় আনা ( ১৭৯২-৯৩ ) থেকে এক টাকা বারো আনা ( ১৭৯৮-৯৯ )। আর তুলার মণ পাঁচ টাকা ( ১৭৯২-৯৩ ) থেকে তেরো টাকা ( ১৮০০-০১ )। কিন্তু মজুরী বরাবর একই থেকে গিয়েছে ১৭৯২-৯৩ সাল থেকে ১৮২২-২৩ সাল পর্যন্ত। প্রতি সের সুতার জন্য লাগত বারো টাকা আট আনা সাড়ে সাত পাই। তুলা সাধারণতঃ শান্তিপুরেই হত—কাপাস তুলা। বছরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মণ জন্মাত। এছাড়াও শান্তিপুরের চাহিদা মেটানো হত বর্ধমান থেকে বছরে ৪০০ মণ তুলা আমদানী করে। শান্তিপুরী 'কাপাস' তুলা খুবই উচ্চমানের ছিল। এর থেকে ১৫ বছরের অল্পবয়স্কা মেয়েরা অর্থাৎ যাদের হাতের তালু তখনও কোমল তারা অতি প্রত্যূষে মাঠের শিশির শুকিয়ে যাওয়ার আগে এই সুতা তৈরী করতেন। তবেই অতি সূক্ষ্ম সুতা তৈরী হত। অন্যথায় সুতা অপেক্ষাকৃত মোটা হত। আর সূর্যের আলোয় সরু সুতা হতই না। শান্তিপুরের কুঠিয়ালদের সম্পর্কে নানারকম গল্প প্রচলিত আছে। তার অন্যতম হল যে মার্জরিব্যাংকস নামক একজন কুঠিয়াল খুব সাধু প্রকৃতির ছিলেন। পরে এঁর নামে চুরি অপবাদ ঘটলে ইনি জহর চুষে আত্মহত্যা করেন। এঁর এক নাবালক পুত্র কুঠির দেওয়ানের ( দেওয়ান চট্টোঃ ) বাড়ীতে বড় হয়ে পরে ম্যাজিষ্ট্রেট হন। কিন্তু এই গল্প কতদূর সত্য তাতে সন্দেহ আছে। অথচ এই 'মাজারিন' সাহেব ১৮২৩ সালের ডিসেম্বরে এক বিধবার সমস্ত সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে তার পরলোকগত স্বামীর কাছ থেকে কোম্পানীর প্রাপ্য ঋণ আদায় করেন।

যাই হোক ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের ফলে অবাধে ব্রিটিশ কাপড় ভারতে আসতে লাগল। ঐ সব কাপড়ের বাজার তৈরীর জন্য সরকার উদ্যোগী হলেন। বিলাতী কাপড়ের ওপর আমদানী শুল্ক কমিয়ে করা হল শতকরা ২½ ভাগ। আর এদেশের রপ্তানী কাপড়ের ওপর বিলাতে শুল্ক শতকরা ১৮ ভাগ থেকে বাড়িয়ে করা হল শতকরা ৮৫ ভাগ। এইভাবে শান্তিপুরী কাপড়ের বিলাতযাত্রা বন্ধ করা হল। ফলে ১৮১৮ সালে কুঠিটি সরকারীভাবে উঠে যায়। কিন্তু এরপরও ওখানে যে কাজ চলেছে তার প্রমাণ আছে।

শান্তিপুরে যে সব ইংরেজ কর্মচারী ঐ কুঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :

# শান্তিপুরের কুঠির ইংরেজ কর্মচারীগণ

১। জন প্রিন্সেপ—কুঠিয়াল ( ১৭৮৩ )

২। জন বেব—কুঠিয়াল ( ১৭৮৪ )

৩। এড্ওয়ার্ড ফ্লেচার—কুঠিয়াল ( ২২ জুলাই, ১৭৮৭-১৮০১ )

৪। টমাস টোয়াইনিং—সহায়ক ( ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩-২৯ মার্চ, ১৭৯৮ )

৫। হেনরী উইলিয়াম ড্রজ—সহায়ক ( ১ মে, ১৭৯৬—১ মার্চ, ১৮০০ )

৬। জর্জ চেষ্টর—প্রধান সহায়ক ( ২৩ জুন, ১৮০১-৮ আগষ্ট, ১৮০৪ )

৭। টমাস আব্রাহাম—রপ্তানী গুদামের উপ-অধিকর্তা ( ১১ জুন, ১৮০২—১২ এপ্রিল, ১৮০৪ )

৮। জন উইলিয়াম প্যাকস্টন—কুঠিয়াল ( ১২ এপ্রিল, ১৮০৪-১৮০৯ )

৯। আর্চিবল্ড্ জর্জ জেমস্ টড্—সহায়ক ( ৯ আগস্ট, ১৮০৪-১৬ আগস্ট, ১৮০৮ )

১০। চার্লস্ বেইলী—কুঠিয়াল ( ২৬ জানুয়ারী, ১৮০৯-২৫ ডিসেম্বর, ১৮১১ )

১১। জন শান—সহায়ক ( ২১ মে, ১৮১১-৬ জুন, ১৮১৪ )

১২। জন নাথানিয়েল সীলি—কুঠিয়াল ( ২৭ জানুয়ারী, ১৮১২-৩১ জানুয়ারী, ১৮১৩ )

১৩। উইলিয়াম রিচার্ড বার্টন বেনেট—কুঠিয়াল ( ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮১৩-১০ মার্চ, ১৮১৫ )

১৪। এড্ওয়ার্ড বার্নেট—কুঠিয়াল ( ১১ মার্চ, ১৮১৫-২৮ মার্চ, ১৮১৭ )

১৫। এড্ওয়ার্ড মার্জরিব্যাংকস্—সহকারী কুঠিয়াল ( ১২ জানুয়ারী, ১৮১৫-২৯ মার্চ, ১৮১৭ )

কুঠিয়াল ( ৩০ মার্চ, ১৮১৭—১৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ )

কুঠিয়াল ( ১৩ নভেম্বর, ১৮২০-এপ্রিল, ১৮৩১ )

১৬। জন ডিক—সহায়ক ( ১০ এপ্রিল, ১৮২২-১৮২৩ )

১৭। হেনরী স্নেইথ—অস্থায়ী কুঠিয়াল ( ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৩০—জুন, ১৮৩৩ )

১৮। চার্লস্ চিচেলী হাইড—অস্থায়ী কুঠিয়াল ( এপ্রিল, ১৮৩১—এপ্রিল, ১৮৩২ )

# শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের একটি পুরানো অধ্যায়

বাংলার তাঁতবস্ত্রের খ্যাতি দীর্ঘদিনের। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্লিনি তাঁর বিবরণে বাংলার মসলিনের চাকচিক্যের উল্লেখ করেছেন। এই খ্যাতি পরবর্তীকালেও অটুট ছিল। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের একটি বিবরণে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ইংলণ্ডে যে সমস্ত জিনিস রপ্তানী হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুতি কাপড, মোটা কাপড, কাপড়ের পর্দা, ছিট ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যেও দেখি মহিলারা পাটের বসন পবতেন। তাও এখানকার তৈরী।

ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই এখানে ব্যবসা করতে আসে। ব্যবসার প্রধান অঙ্গই ছিল কাপড। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক হিসাবে ইংরেজ ব্যবসাদাররা বলছেন—বাংলার সুন্দর কাপড আমরা ৭ শিলিং হিসাবে কিনি। আর ইংলণ্ডে এর এতই সমাদর যে, প্রতি কাপড বিক্রি হয় ২০ শিলিং দরে। বাংলার কাপড়ের এই জনপ্রিয়তার ফলে ইংলণ্ডের প্রস্তুত কাপড বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন করে যে, অতঃপর বাংলাদেশ থেকে আনা সাদা কাপড় অথবা এখানে এনে রং করা কাপড অথবা বাংলাদেশের চকচকে রঙীন কাপড ইংলণ্ডের কেউ পবতে পারবে না। এগুলি ব্যবসাদাররা আমদানী করে আবার অন্যদেশে রপ্তানী করবে। কিন্তু এত আইন সত্ত্বেও বাংলার কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করতে পারা যায়নি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে এদেশের শাসনভার লাভ করা পর্যন্ত এই ব্যবসার অবস্থা প্রায় একইরকম ছিল।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত শান্তিপুরেও এই কাপড বোনা শিল্প দীর্ঘদিন ধরে গডে উঠেছিল। এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা না গেলেও এ শিল্প যে অনেকদিনের তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈতাচার্যের কাছে এলে শান্তিপুরের 'যত তন্তুবায়গণ' তাঁর কাছে যান। অর্থাৎ সেই সময়েও শান্তিপুরে তন্তুশিল্পীদের প্রাচুর্য ছিল।

তাই শান্তিপুরের তাঁতশিল্প ইংরেজদের এখানে আনে। সত্বর তারা কাপড় কেনার জন্য কুঠি নির্মাণ করে। পলাশীর যুদ্ধের বছরে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শুধু শান্তিপুর আডঙে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মূলধন বিনিয়োগ করে ১,৬৮,৫০০ টাকা। এইসব টাকার বেশীর ভাগই তাঁতীদের কাছে দাদন হিসাবে দেওয়া হত। এই দাদনের টাকা বিলি করা হত কোম্পানীর গোমস্তার মাধ্যমে। এইসব দেশী গোমস্তা কোম্পানীর স্বার্থে জোর জবরদস্তি করে তাঁতীদের কাছ থেকে সস্তায়

কাপড় আদায় করত। এতে কোম্পানীর লাভ খুবই বাড়তে থাকে। তাই ১৭৫৮ ও ১৭৫৯ এই দু'বছরে পর পর দুটি চিঠিতে দেখা যায় যে, তারা একদিকে গোমস্তাদের কাজে সন্তোষপ্রকাশ করছে এবং অপরদিকে আরও টাকা বিনিয়োগের কথা বলছে।

এরই মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানীর অধিকার পেলেন। এতদিন কাপড় ইত্যাদি তাঁরা কিনতেন স্বর্ণের বিনিময়ে। অর্থাৎ ইংলণ্ড থেকে নগদ টাকা এনে কাপড় কিনতেন। অতঃপর তাঁরা লণ্ডন থেকে পশমী কাপড় এখানে আমদানী করতে লাগলেন। তার বিক্রীত অর্থ দিয়ে কাপড় কেনা শুরু করলেন। আর অন্যদিকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল। দেশের এই অর্থনৈতিক দুর্দশার সুযোগে এক বিরাট সংখ্যক ইউরোপীয় ব্যবসায়গোষ্ঠী তাদের টাকা নিয়ে তাঁতীদের কাপড় কিনতে শুরু করল। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যক্তি নিজ নিজ ব্যক্তিগত ব্যবসাও শুরু করলেন। ফলে কোম্পানীর ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ পর্যায়ে যেতে লাগল।

এর থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কোম্পানী একদিকে তাঁতীদের সুযোগ সুবিধা কিছু বাড়িয়ে দিল এবং কাপড়ের দামও কিছু বাড়াল। অপরদিকে তাঁতীদের ওপর জোর জবরদস্তি চলল যাতে তারা কোম্পানীকেই কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ১৭৫৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানী নিজেরাই তাঁতীদের কাছে দাদন হিসাবে আগাম টাকা দিতেন। কিন্তু এতে তাদের বক্তব্য হল যে তারা ঠিকমত কাপড় পায় না। তাই এদেশী গোমস্তার মাধ্যমে কাপড় সংগ্রহের ব্যবস্থা শুরু করে। একজন ইংরেজ মিঃ বোল্টস্ কীভাবে তাঁতীদের কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য করা হত তার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: 'ঐ গোমস্তা তাঁতীদের একটা নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় দেবার জন্য কাগজে সই করিয়ে নেয়। আর অল্প কিছু টাকা আগাম হিসাবে দেয়। সত্যি বলতে কি ঐসব গরীব ও দেশী তাঁতীদের কোনরকম সম্মতি নেওয়ার দরকার আছে বলেও গোমস্তা মনে করে না। খানিকটা জোর করে সই করিয়ে নেয়'।

এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদে শান্তিপুরের তাঁতীরা সংগঠিত ভাবে কলকাতায় কোম্পানীর সদরে গিয়ে অভিযোগ আনেন। ১৭৭৩ সালের ১২ই এপ্রিলের একটি চিঠিতে এই ঘটনার উল্লেখ করে কোম্পানীর কর্মকর্তারা বলছেন যে, শান্তিপুরের তাঁতীদের অভিযোগ সর্বৈব সত্য। তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কথাও আমরা জানতে পারলাম। তারা কাপড়ের জন্য যা দাম পাচ্ছে তাতে তাদের খরচই ওঠে না।

ছিয়াত্তর মন্বন্তরের ফলে দেশের আর্থিক দুর্গতি যেমন বাড়ে সেইরকম

অনাহারে তাঁতীদের বিরাট অংশ মারা যায়। এই সময়ে শান্তিপুরের তাঁতীরা এক আবেদনে বলেছেন যে, গত কয়েক বছর ধরে সুতার দাম বেড়েই চলেছে। দুর্ভিক্ষ প্রচুর তাঁতীকে এবং সুতা কাটনীকে মেরে ফেলেছে। ফলে সুতার দাম শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে শান্তিপুরের তাঁতীদের আরও দুটি আবেদনপত্রের উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটি ১৭৮৬ সালের ১২ই জুলাই শান্তিপুরে মিঃ বেব-এর কাছে দেওয়া হয়। পরেরটি ১৮০১ সালের ২৬শে জানুয়ারী শান্তিপুরের অধীন সোনাবেড়িয়া গ্রামের তাঁতীরা কলকাতায় কোম্পানীর কাছে পাঠায়। প্রথম আবেদনটি নিম্নরূপ :

"আমরা দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানীর কাছে কাপড় দিয়ে আসছি। কিন্তু আড়ঙের কাজ যখন থেকে দালালের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তখন থেকেই আমরা চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছি। মিঃ বিউল্যাণ্ডের ম্যানেজারীর সময়ে বর্তমান ১৭৮৪-৮৫ সালের কাজকর্ম তাঁর গোমস্তা কিশোর সান্যাল ও দালাল বা কর্মচারীরা করছে। এঁদের হাতে পড়ে আমাদের ভাতকাপড় বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছে। আমাদের বোনা অতি মিহি কাপড়কে তাঁরা মিহি বলেন, মিহি কাপড়কে মাঝারী বলেন আর মাঝারী কাপড়কে অতি সাধারণ মোটা কাপড় বলে দাম দিচ্ছেন। আমাদের নয়নসুখ কাপড় বোনার জন্য আগাম দেওয়া হয়। যেই নয়নসুখ বুনে নিয়ে যাই তখন সেই কাপড়কে মোটা কাপড় বলে খুবই কম দাম দেয়। এইরকম মাগ্‌গী-গণ্ডার দিনে ঐরকম কম দাম দেওয়ায় আমরা ঘরের থালাবাটি বেচে ভাত যোগাড় করছি এবং এ জায়গা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমরা জানিনে কীভাবে মিঃ বিউল্যাণ্ড ও তাঁর গোমস্তার হাত থেকে রেহাই পাব। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে, কাপড় সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকদের আড়ঙে পাঠান। আমরা সদর কর্তৃপক্ষের মনোমত কাপড় পাঠাব। আমরা তাতে আনন্দের সঙ্গে কাজ করব। যেসব কাপড় ইচ্ছে করে নীচুস্তরের বলে গণ্য করা হয়েছে সেগুলি আমাদের ফেরৎ দেওয়া হোক। যদি ঐ গোমস্তা ও অন্য কর্মচারীদের সরিয়ে অন্য লোক পাঠানো হয় তবেই আমরা আপনাদের আড়ঙে কাপড় দেব। তা না হলে আমরা আর এখানে থাকব না। আমরা গরীব মানুষ, আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলাম।"

পরের আবেদনটি হল :

"আমরা দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানীর আড়ঙে মাল দিয়ে আসছি। আমাদের চুক্তিমত যে দাদন আমরা নিই সেই পরিমাণ কাপড়ও আমরা দিই। কিন্তু গত ছয়-সাত বছর ধরে মনোহরগঞ্জের গোমস্তা জগমোহন চৌধুরী ও খাজাঞ্চি রামানন্দ ভাদুড়ী আমাদের টাকা দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক আট ন'টাকা থেকে একটাকা দস্তুরী হিসাবে কেটে নিচ্ছে। আমাদের দাদন নেওয়া টাকার চুক্তিমত কাপড়

বুনে আমরা গোমস্তাকে বুঝিয়ে দিই। তারপর আমাদের অনুপস্থিতিতে সেবারাম সান্যাল ও পাঁচু জসনদার ( কাপড় মাপকারী ব্যক্তি ) দুজনে মিলে কাপড়গুলিকে নীচুশ্রেণীর মাল বলে টিকিট পালটে দিয়ে কলকাতায় পাঠান। এইভাবে আমরা প্রতি কাপড়ে আমাদের ন্যায্য দামের চেয়ে তিন-চার টাকা কম পাই।

তার ওপর তিনি প্রতি টাকায় এক আনা করে দস্তুরী কাটেন। আমরা জানিনে তাঁরা সরকারের কাছে কত করে মাইনে পান। কিন্তু যখন সোনার মোহরের ওপর বাটা থাকে তখন তিনি আমাদের ঐ মোহরে পাওনা মেটান। আবার যখন মোহরের ওপর ছুট থাকে তখন নানারকম টাকায় দাম দেন। ঐ টাকাগুলির মূল্যমান তখন একআনা থেকে দেড়আনা করে কম। ( এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে দেশে আর্কটি মুদ্রা, নারায়ণী মুদ্রা, বেনারসী মুদ্রা, বাদশাহী মুদ্রা প্রভৃতি নানারকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এদের মূল্যমানও কমবেশী হত। ১৭৩৭ সালে কলকাতার ব্যবসাদাররা কাউন্সিলকে এক চিঠিতে জানান যে তাঁরা শান্তিপুরে তাঁদের গোমস্তার মারফৎ জেনেছেন যে ওখানে আর্কটি টাকা চলবে না। ) ফলে আমাদের খুবই লোকসান হয়। এইভাবে নানাদিক থেকে শোষিত হয়ে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি। তাই আমাদের অনুরোধ যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেন বড় গোমস্তা সেবারাম সান্যাল, পাঁচু জসনদার, গোমস্তা জগমোহন চৌধুরী ও খাজাঞ্চি রামানন্দ ভাদুড়ীকে অবিলম্বে সরাবার ব্যবস্থা করে আমাদের দুঃখ নিবারণ করেন।"

ওপরের আবেদনপত্র দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁতারা কতরকম ভাবে শোষিত হত। তাছাড়া ভাল তাঁতীর কাজ পাওয়াও ক্রমশঃ দুরূহ হয়ে উঠল। এ ব্যাপারে ১৮১০ সালের ১৩ই অক্টোবরের একটি চিঠিতে শান্তিপুরের কুঠির ম্যানেজার চার্লস বেইলী কিছু মন্তব্য করেন। তাঁর মতে ভাল তাঁতীদের যদি সবসময়ে কাজ দেওয়া যায়, তবেই ভাল কাজ পাওয়া যাবে। ভাল তাঁতী যদি বছরে চার-পাঁচ মাস কোম্পানীর কাছ থেকে ভাল কাপড় বোনার অর্ডার না পায় তখন বাধ্য হয়ে তাকে পেটের দায়ে মোটা কাপড় বুনতে হবে যাতে তা সাধারণ বাজারে বিক্রি হয়। ফলে তার হাতের সূক্ষ্ম কাজ ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যেহেতু ইংলণ্ডে ঐ সূক্ষ্ম কাপড়ের চাহিদা রয়েছে তাই অবিলম্বে তাদের বেশী কাজ দেওয়া দরকার। তিনি আরও কয়েকটি গুরুতর কথা বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শান্তিপুর আড়ঙের কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও নীচুমান সম্পর্কে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছিলেন। তার জবাবেই তিনি তাঁতীদের পক্ষে এই কথাগুলি বলেন। তাঁর মতে ভাল তাঁতীদের না হয় বেশী করে কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ তাঁতীদের কাজ দেওয়া হয় খুবই কম। ফলে তারা ঋণের পর ঋণ করেই চলেছে। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেচে যে

তাদের দু'বেলা ভাত জোটে না। সংসারের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে দাদন নেওয়া টাকা অনুযায়ী মাল দেওয়া ও সেই কাপড়ের গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে কলের কাপড় তৈরী হতে থাকে এবং এদেশেও তা আমদানী হতে থাকে। অপরদিকে কোম্পানী তাদের ব্যবসা কাপড়ের পরিবর্তে সোরা, চিনি ইত্যাদিতে সরিয়ে নিতে থাকে। ফলে চাহিদার অভাবে শান্তিপুরের কুঠি ১৮১৮ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এতদিন ধরে তাঁতীরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কাপড় বিক্রির সুযোগ পেয়েছিলেন। কুঠি বন্ধ হওয়ায় তাঁরা খুবই দুরবস্থার মধ্যে পড়েন। মেয়েরা যাঁরা সুতা কাটতেন তাঁরা বেকার হয়ে পড়লেন। কুঠি বন্ধ অর্থনৈতিক দিক থেকে শান্তিপুরের পক্ষে সুখের হয়নি। কুঠিয়ালদের শত অত্যাচারেও তাঁতীরা কিন্তু কুঠিতে মাল দিতে চাইতেন। তার একটা বড় কারণ নগদ টাকায় কাপড় বিক্রির ব্যবস্থা। যাই হোক ইংরেজ কুঠি শান্তিপুরের তাঁতীদের একটি বড় উপকার করে গিয়েছিল। তাঁরা শান্তিপুরের তাঁতীদের সূক্ষ্ম কাপড় বোনায় উৎসাহ যোগান। কুঠি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যখন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তাঁতীরা চাষবাস বা অন্য কাজে নিযুক্ত হলেন তখন শান্তিপুরের তাঁতীরা তাঁদের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী করে নতুন গজিয়ে ওঠা 'বাবু' সমাজের কাছে 'নতুন বাজার' পেলেন। ফলে শান্তিপুরের তাঁতশিল্প অনেক ঝড় ঝাপটা সহ্য করেও বেঁচে থাকল।

# শান্তিপুরের গণ-সংগ্রাম—কোম্পানীর আমলে

আপোষ নয়—সংগ্রাম, বশ্যতা নয়—মৃত্যু,—এই হ'ল শান্তিপুরের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য শান্তিপুরে আবহমানকাল চলে আসছে। তারই এক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দুশোবছর আগে কোম্পানীর আমলে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা এদেশের অধিকারী হয়। কিন্তু তারও অনেক আগে থেকেই তারা ব্যবসার খাতিরে শান্তিপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কোম্পানীর ব্যবসার অন্যতম প্রধান জিনিসই ছিল কাপড রপ্তানী। এই উদ্দেশ্যে তারা শান্তিপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে তাঁতীদের নিয়ে গিয়ে কলকাতায় তাদের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল যাতে ঐসব তাঁতীদের কাপড়ের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকে। এজন্য তারা মফঃস্বলের তাঁতীদের বেশী বেশী টাকার দাদন দিতে লাগল। সেই সঙ্গে দেশীয় লোকদের এই কাজের জন্য গোমস্তা নিয়োগ করল। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দেব ২০শে মে কোম্পানীর রোজনামচায় লেখা আছে যে, গত বছরের মত এবারও গ্রামের তাঁতীদের কাছে বড বড অংকের কাপডের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাদের লোভ বাডবে এবং কলকাতায় আমাদের এলাকায় এসে বসবাস শুরু করবে। কিন্তু গত বছর কোম্পানীর লাভ আশানুরূপ হয়নি—কারণ তাঁতীরা ঠিকমত কাপড দেয়নি। তাই এবার স্থানীয় এক একটি ব্যক্তির মাধ্যমে ঐ অর্ডার দেওয়া হবে যাতে ঐ লোকটি জোরজবরদস্তি কবেও কাজ আদায় করতে পারে। এর জন্য ঐ লোকটিকে মোট অর্ডারের শতকরা তিনভাগ দালালী দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চের এক চিঠিতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ঢাকা, কাশজোডা ও শান্তিপুরের তাঁতীদেব মধ্যেই বেশী করে দাদন দিতে হবে।

একদিকে যেমন দাদন দিয়ে কলকাতায় তাঁতীদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলল তেমনি অপরদিকে খাস শান্তিপুরে বসেই কাপড় সংগ্রহের চেষ্টা হতে লাগল। অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই স্বার্থেও শান্তিপুরে কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হল। এরই মাঝামাঝি সময়ে শান্তিপুরে তাঁতীদের মধ্যে দেখা দিল বিক্ষোভ। শুধু বিক্ষোভ বললে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং বলা যায় বিস্ফোরণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন শান্তিপুরে আসে তখন এখানকার তাঁতীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে এগারো হাজার। তাদের মধ্যে শতকবা ৭০ জন ছিলেন মহাজন আশ্রিত। তা'হলেও এই ৭০ ভাগ শিল্পীর সঙ্গে মহাজনদের সম্পর্ক ঠিক শোষক-শোষিতদের মত ছিল না। বাকী ৩০ ভাগ লোক নিজের নিজের ব্যবসায় রত ছিলেন। কোম্পানীর কুঠির জন্য এদের মধ্যে থেকে তাঁতী যোগাড করতে

কোম্পানীকে খুবই বেগ পেতে হয়। কারণ তাঁরা জানতেন যে কোম্পানীর আসল স্বরূপ কিছুদিন পরে বের হবে। তা সত্ত্বেও দালালদের হাতছানি, আগাম মজুরী, নানা প্রলোভনই জয়ী হল। এই প্রলোভন এমন পর্যায়ে ওঠে যে সাহেবরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লজেন্স, বিস্কুট, নানা রংয়ের কাঁচের পুতুল প্রভৃতি দিয়ে মন ভোলাত। ধীরে ধীরে কুঠিয়ালদের কাছে তাঁতীরা নতি স্বীকার করলেন। তাঁরা তাঁদের কাপড় দিতে শুরু করলেন।

কিন্তু কুঠি প্রতিষ্ঠার আগে যে দালাল বা গোমস্তার মাধ্যমে শান্তিপুর থেকে কোম্পানী কাপড় সংগ্রহ করত তিনি ছিলেন জনৈক সান্যাল উপাধিকারী এক ব্যক্তি। তিনি যদিও কোম্পানীর কাছে ভালরকমের দালালী পেতেন তবুও অর্থের লোভে তাঁতীদের ঠকাতে শুরু করলেন। অযথা ও অন্যায্যভাবে তাদের কম দাম দিতে লাগলেন। অনেক কাপড় খারাপ হয়েছে বলে কোম্পানী দাম দেয়নি—ইত্যাদি বলে গরীব তাঁতীদের প্রচণ্ডরকমভাবে হয়রানি করতে লাগলেন। এমনকি অর্ডারমত কাপড় নিয়ে আসার পরও সেগুলির মানগত উৎকর্ষহীনতার দোহাই তুলে না কেনার হুমকি দিয়ে তাঁতীকে কমদামে বিক্রি করতে বাধ্য করার মত জুলুমও চলতে লাগল। ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত তাঁতীরা প্রচণ্ড ক্রোধ ও ক্ষোভে প্রায় দিশেহারা হয়ে ওঠে। তার মধ্যে থেকে জেগে উঠল তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন। শান্তিপুরের প্রথম সংগঠিত আন্দোলন। সমস্ত তাঁতী এক হয়ে সভা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে, এই অন্যায় অত্যাচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোম্পানীকে আর কাপড় বিক্রি করবেন না। শুধু তাই নয়। তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদকে রূপ দিতে পায়ে হেঁটে চললেন কলকাতায় কোম্পানীর সদর দপ্তরে। সেখানে সমস্ত রাত্রি তাঁরা কোম্পানীর দপ্তরের সামনের খোলা মাঠে বসে থাকলেন। সকালে কোম্পানীর বড় কর্তারা তাঁদের বক্তব্য শুনলেন। গোমস্তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করলেন। সেইসঙ্গে ইংরেজদের দু'চোখ বিস্ফারিত হল তাঁতীদের সম্মিলিত শপথ শুনে—'এই অত্যাচারের প্রতিবিধান না হলে আমরা একখানা কাপড়ও দেবনা কোম্পানীকে। অন্য জায়গায় বিক্রি করব'। কোম্পানী জানতেন যে, ফরাসী ও ওলন্দাজরা তখনও এইসব ব্যবসায়ে আগ্রহী। শুধু তাই নয়, কোম্পানীর কাছে খবর এলো যে এইসব বিক্ষোভকারী তাঁতীদের একাংশ কলকাতার আশপাশের তাঁতীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন যাতে তারাও কোম্পানীকে কাপড় না দেয়। ইংরেজরা প্রমাদ গুনলেন। বুঝলেন যে তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থ কী ভীষণরকম ক্ষুণ্ণ হতে যাচ্ছে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে নতিস্বীকার করলেন। তাঁতীদের কাছে কথা দিলেন যে, কোম্পানী অবিলম্বে এর প্রতিবিধান করবে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে অফিসার শান্তিপুরে আসেন। তিনি খুব ভালভাবে সমস্ত দিক বিচার করে কলকাতায় রিপোর্ট করেন। সেই

রিপোর্টের ভিত্তিতে ঐ গোমস্তাকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁতীদের সব দাবী মেনে নেওয়া হল। তাঁতীদের আপোষহীন সংগ্রাম জয়লাভ করল। শান্তিপুরের সংগ্রামী আন্দোলনের একটি দিকচিহ্ন সূচিত হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লণ্ডনে কোম্পানী এই চরম বিপদের কথা জানাল। ভবিষ্যতে এরকম সংগঠিত আন্দোলন হলে তাদের কী সর্বনাশ হবে তাও বুঝিয়ে বলা হল। লণ্ডন থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তাঁতীদের সম্পর্কে নতুন আইন হল। ঐ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই রাজস্ব পর্ষদ ও আফিম প্রস্তুতকারক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফিসের এবং কলকাতা পুলিশের প্রতিবেদন রচনাকারী জর্জ চালর্স মেয়ের তা বাংলায় অনুবাদ করলেন। ১২ পৃষ্ঠার এই অনুবাদটি কোম্পানীর প্রেসে কলকাতায় ছাপা হয়। আইনটির মুখবন্ধে লেখা আছে: "এ দেশীয় সকল তাঁতী লোক অধিকন্তু যাহারা শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের ব্যাপারে নিযুক্ত আছে তাহার দিগের পক্ষে যে হুকুমনামা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার তর্জমা এই।" এই আইনটি আরও একটু কঠোর করে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এর একটি 'অতিরিক্ত' আইন বের হয়। সেটিও জর্জ চার্লস মেয়ের বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

এই নতুন আইনও শান্তিপুরের তাঁতীদের বাধতে পারেনি। একদিকে কুঠিয়ালদের অত্যাচার বাড়তে লাগল। তাঁতীদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হল। কাপড় না দিলে মারধোর থেকে শুরু করে ঘরবাড়ী থেকে উৎখাতও করা হল। অপরদিকে কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবার শান্তিপুরে তীব্র আন্দোলন শুরু হল। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলন শেষে এমন পর্যায়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে আইন করে শান্তিপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়। শান্তিপুরের সেই দ্বিতীয় গণ-সংগ্রাম আর এক গৌরবময় ইতিহাস যা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

# শান্তিপুরের কুঠি ও এক ইংরেজ চিত্রশিল্পী

ভারতে প্রথম ব্রিটিশ যুগে যে সব চিত্রশিল্পী ভারতীয় জীবনযাত্রা ও দর্শনীয় স্থানসমূহের ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের অন্যতম হলেন আর্থার উইলিয়াম ডেভিস। তাঁর আঁকা যেসব ভারতীয় জীবনযাত্রার ছবি রয়েছে তার মধ্যে তাঁতী, কুমোর, নুন তৈরীর মলঙ্গী প্রভৃতির ছবি উল্লেখযোগ্য। এইসব ছবির স্রষ্টার কাজ দেখে বোঝা যায় যে, দেশীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় না থাকলে এবং ঐ সব কর্মীদের কাজকর্ম নিজচোখে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে তাদের জীবনযাত্রার এই নিখুঁত ছবি আঁকা সম্ভব নয়। প্রকৃত ঘটনাও তাই। মিঃ ডেভিস দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। সেই সুবাদে তিনি শান্তিপুরেও আসেন এবং এখানে দীর্ঘ দুবছর ধরে বাস করেন। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে শান্তিপুরের এই দান স্মরণযোগ্য।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়ার' নামক পত্রিকায় ঐ চিত্রশিল্পী একটি বিজ্ঞাপন দেন। তাতে তিনি আবেদন জানান যে, তিনি বাংলার দেশীয় শিল্পকলা, কারুশিল্পী ও কৃষি বিষয়ের ওপর একগুচ্ছ ছবি আঁকতে চান। এর জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থের আবেদনও জানান। তাতে আরও বলা হল যে, মোট এইরকম ত্রিশটি ছবি আঁকা হবে এবং স্বয়ং ডেভিসের তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ডে ঐ সব রঙীন ছবি ছাপা হবে। প্রতিটি ছবির তলায় তাদের বিষয়বস্তুও লেখা থাকবে। মোট তিন খণ্ডে এই ছবিগুলি প্রকাশ করা হবে এবং দাম পড়বে ১৩৫ পাগোড়া। ( পাগোড়া ছিল দক্ষিণ ভারতীয় মুদ্রা বিশেষ। তৎকালীন টাকার অংকে প্রায় তিন টাকার সমান। ) পাউণ্ডের হিসাবে এর মোট পরিমাণ ছিল ৫৪ পাউণ্ড।

ডেভিসের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। কলকাতার অধিবাসীরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ১৭৯২-এর ১৬ই মার্চ তারিখে তাঁকে মহীশূর যুদ্ধের ওপর ছবি আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডেভিস সেটি শেষ করার জন্য খুব একটি উদ্যোগ নেননি। তাই তাঁরা ঐ ছবির ব্যাপারে জোর তাগাদা দিতে শুরু করলেন।

মনে হয় ঐ ছবিটি সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর পরিকল্পনামত দেশীয় বিষয়বস্তু আঁকার জন্য তিনি কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে তিনি যাত্রা করলেন। গন্তব্যস্থল হিসাব বেছে নিলেন শান্তিপুরকে। এ ব্যাপারে তাঁর জীবনীকার মিলড্রেড্ আর্চার ( ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ব্রিটিশ প্রোট্রেটরস্ লণ্ডন, ১৯৭৯ ) লিখছেন যে, শান্তিপুর কলকাতা থেকে

প্রায় ষাট মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি পল্লীশহর। এইখানে বাস করাতে একদিকে যেমন তাঁর জীবনযাত্রার ব্যয় গেল কমে তেমনি তাঁর পরিকল্পনামত ছবিগুলি আঁকার সুযোগ, সময় ও পরিবেশও তিনি পেয়ে গেলেন। বলা যায়, শান্তিপুরকে বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়ে তিনি একটি আদর্শ স্থানই পেয়ে যান। এটি একদিকে বাংলার মসলিম তৈরীর কেন্দ্র, অপরদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর কারুশিল্পী ও কৃষক শ্রেণীর প্রাচুর্য তাঁর পরিকল্পিত ছবিগুলির উৎস হয়ে দাঁড়াল। তিনি এদের জীবনযাত্রা ও কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলেন। তিনি এখানকার ইংরেজ কুঠিতে অবস্থান করতেন।

ডেভিসের শান্তিপুর আসার কিছুদিন পরে এখানকার কুঠির অধ্যক্ষের সহকারী নিযুক্ত হন টমাস্ টোয়াইনিং (১-২-১৭৯৩)। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, শান্তিপুর অতি বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান শহর। গঙ্গার দু'মাইল পূর্বে এবং কলকাতার ষাট মাইল উজানে এর অবস্থান। এখানে প্রায় ৭০ হাজার লোক বাস করে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় ও সুখী অধিবাসী। সমস্ত জনসাধারণই হচ্ছে হিন্দু এবং এই জায়গাটি জেলার সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এখানকার তৈরী মসলিন বহুযুগের ঘাত প্রতিঘাতে সর্বোত্তম শ্রেণীর সূক্ষ্ম বস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ভারতের তৈরী কাপড়ের মধ্যে এখানকার কাপড়ই সর্বোৎকৃষ্ট। সমগ্র ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে এটি রপ্তানী হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের কারণও এইটি।

তাই সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, মিঃ ডেভিস শান্তিপুরের ইংরেজ কুঠিকে তাঁর আদর্শ বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করায় ভালই হয়েছিল। এখানকার বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত নর-নারীদের ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ তিনি পান।

ইতিপূর্বে ডেভিস ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করবার সময়ে সেখানকার জনগণের জীবনযাত্রার কিছু কিছু স্কেচ্ করে এনেছিলেন। এখানে সেগুলিও সম্পূর্ণ করেন। পাটনায় (১৭৩৬-এর শরৎকালে) তিনি কাগজ তৈরী, কাঁসার বাসনের দোকান, সোরা তৈরী ও সতরঞ্চি তৈরীর স্কেচ্, তমলুকে থাকার সময়ে সুন্দরবনে নুন তৈরীর (নুন শুকানো ও নুন সংগ্রহ) স্কেচ্ করে রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ কলকাতায় থাকার সময়ে মুদ্রা তৈরী ও মুদ্রার ধাতু পরীক্ষকের স্কেচ্ও করে রেখেছিলেন। শান্তিপুরে বসে এগুলি সমাপ্ত করেন। এছাড়া শান্তিপুরে আরও নতুন ছবি আঁকলেন। তার মধ্যে রয়েছে দু'খানি কাপড় তৈরীর ছবি, লাঙল দেওয়া অবস্থায় কৃষকের ছবি, ঘানিতে তেল তৈরী, আখমাড়াই কল, কামারের দোকান, হাঁড়ি কলসী তৈরীরত কুমোর, যাঁতা পেষাইরত মহিলা এবং চরকায় সুতো কাটা অবস্থায় মহিলার ছবি।

১৭৯২-এর ১৮ই অক্টোবর কলকাতা গেজেটে ঘোষণা হল, 'মিঃ ডেভিস এখন শান্তিপুরে রয়েছেন। ছবি আঁকার কাজে খুবই ব্যস্ত। এর থেকে বাংলার শিল্প ও জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যাবে। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এইসব ছবির কাজ এত দ্রুত হচ্ছে যে, যেসমস্ত গুণগ্রাহী এব্যাপারে তাঁকে আগেই সাহায্য করেছেন তাঁরা তাঁদের প্রিয় চিত্রকরের কাছ থেকে প্রত্যাশামত ছবির নমুনা শীঘ্রই পাবেন।' প্রখ্যাত চিত্রকর উইলিয়াম বেইলী এঁর চিত্র সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। কুমোরের ছবি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'একটি মনোরম হৃদয়গ্রাহী ছোট ছবি'। শান্তিপুরের কুঠিতে থাকবার সময়েই মিঃ ডেভিস সম্ভবত তাঁর বিখ্যাত ছবি কর্নওয়ালিশের প্রতিচ্ছবি আঁকেন। সব ছবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের ব্যাপারে তিনি এত সচেতন ছিলেন যে ঐ বছরের আগষ্টে তিনি মাদ্রাজ যান শুধুমাত্র মহীশূরের বন্দীদের আকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে, যাতে মহীশূর যুদ্ধের ছবিটি সবদিক থেকে পরিচ্ছন্ন হয়।

চলে যাওয়ার আগে ডেভিস শান্তিপুরে আঁকা এইসব জীবনযাত্রার ছবি সঙ্গে নিয়ে যান। ১৭৯৩-এর ৫ই অক্টোবর 'মাদ্রাজ ক্যারিয়ার' ঘোষণা করলেন, "মিঃ ডেভিসের হিন্দু জীবনযাত্রার ছবিগুলি জীবন্ত বলে মনে হয়। মেয়েদের মুখগুলো দেখলে মনে হবে এরা কি সরল, নিষ্পাপ ও সুন্দরী।"

১৭৯৪-এর ৮ই জানুয়ারী তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করে কলকাতার পথে যাত্রা করেন। এর ঠিক একবছর পরে ১৭৯৫-এর ১৭ই জানুয়ারী মাদ্রাজ গেজেট লেখেন যে, ডেভিসের ছবিগুলি ছাপা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং গ্রাহকরা বারো থেকে পনেরো মাসের মধ্যে তাঁদের কপি পাবেন।

ডেভিস ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে ফিরে যান। সেখানকার রয়্যাল একাডেমিতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মূল ছবিগুলির একটি প্রদর্শনী করেন। তার মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল : চাকে কর্মরত কুমোর, পাটনায় দেশী কাগজ তৈরী এবং শান্তিপুরের একটি তাঁত ঘরের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য—যাতে ছোট বড় সকলকে তাঁতের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

আজ থেকে দুশো বছর আগে শান্তিপুরের বুকে বসে একজন বিদেশী শিল্পী এখানকার শিল্পীকর্মীদের ছবি এঁকে নিয়ে যান এবং সারা পৃথিবীতে তা' প্রদর্শিত হয়—এটি নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

## আদি বাহনের চাকা

শান্তিপুরে যে অজস্র শিল্পীসত্তা নীরবে সকলের অজ্ঞাতে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে চলেছে তার অন্যতম হল গরুর গাড়ীর চাকা নির্মাণ। এই শিল্পকর্মের মধ্যে যে কত গভীর সূক্ষ্মতা ও কর্মনিপুণতা প্রয়োজন তা সাধারণভাবে বোঝাই যায় না। অথচ এই অতিপরিচিত শিল্প ও শিল্পীরা অনালোচিত, অসমাদৃত।

শান্তিপুরের তৈরী চাকা এতই বিখ্যাত যে শান্তিপুরের বাইরে নদীয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে গরুর গাড়ীর চাকা সংগ্রহের জন্য লোক আসেন। তা সত্ত্বেও এই চাকা তৈরীর সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও শিল্পী পরিবার ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু। তার অন্যতম প্রধান কারণ ভাল কাঠের অভাব এবং তৈরী চাকার বিক্রয়জাত লাভ থেকে বর্তমানের এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার প্রতিপালনে অসচ্ছলতা। এখন মাত্র ১০টি পরিবার এই কাজে নিযুক্ত। প্রধানতঃ হাড়ি, বাগদি, রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এছাড়া কিছু মুসলমান শিল্পীও এই কাজ করেন।

এক একটি গরুর গাড়ীতে মোট দুটি চাকা থাকে। এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে আর একটি কাঠের দ্বারা যুক্ত থাকে। তাকে বলা হয় ধুরো বা ধুরা। প্রতিটি গোল চাকার ঠিক মধ্যবর্তীস্থানে আর একটি গোলাকার মোটা কাষ্ঠখণ্ড থাকে। একে বলা হয় 'হাঁড়ি' বা 'লা'। একে কেন্দ্র করেই চাকাটি খাড়া থাকে। চাকাটি যে চক্রাকার কাঠ দিয়ে নির্মিত তাকে বলা হয় 'বেড়' বা 'পুটে'। এই পুটের সঙ্গে মধ্যস্থিত হাঁড়ি ( লা ) কয়েকটি কাঠের ডাণ্ডা দ্বারা সংযুক্ত। এই কাঠগুলিকে বলা হয় 'আড়া'। সাইকেলে যেভাবে স্পোক থাকে ঐ আড়াগুলিও চাকার স্পোকের কাজ করে। প্রতিটি চাকায় ছ'খানা করে আড়া থাকে। আড়াগুলি লা'কে ভেদ করে পুটের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যায়। বাইরে থেকে মনে হয় হাঁড়ি ( লা ) কে ঘিরে এই ডাণ্ডাগুলি ( আড়া ) সবদিক থেকে হাঁড়ির ওপর বসানো হয়েছে টুকরো টুকরো করে। প্রকৃতপক্ষে এই আড়াগুলিকে আস্ত অবস্থায় হাঁড়ির ( লা' এর ) মধ্যে ঢোকানো হয় মোট বড় আকারের তিনখানা। আড়া-গুলির উভয়প্রান্তই সরু, মাঝখানে মোটা। এমতাবস্থায় হাঁড়ি বা লা' এর মধ্যদিয়ে গর্ত করে ঐগুলিকে প্রবেশ করানো খুবই মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। খুব দক্ষ শিল্পী ভিন্ন অন্য কারোর পক্ষে ঐরকম গর্ত বা ছিদ্র করা সম্ভব নয়। প্রতিটি আড়া লম্বায় হয় ৫৪ ইঞ্চি। চওড়া হয় তিন সাইজের—তিন ইঞ্চি, সাড়ে তিন ইঞ্চি ও আড়াই ইঞ্চি। বেধ বা 'দল' দেড় ইঞ্চি মোটা। পুটের কাঠে গর্ত করে ঐগুলি আঁটা হয়। এক একটি চাকা উচ্চতায় হয় তিন হাত সাইজের। সমগ্র চাকাটিকে গোলাকারে পরিণত করতে যে বেড় বা পুটে থাকে তাকে ৬ ভাগে ভাগ করে ৬ খানা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়। এর প্রত্যেকখানা কাঠ হয় ২৭ ইঞ্চি করে। মোট বেড়ের গোলাকৃতির পরিমাণ হয় ১৬২ ইঞ্চি। এই পুটের কাঠের

চওড়া হয় ছয় থেকে সাড়ে ছয় ইঞ্চি। পুটের কাঠগুলি অল্প বৃত্তাকার করে কাটা হয়। সবগুলি যোগ করে তবেই পূর্ণবৃত্ত লাভ করে। এই কাঠগুলি জোড়া হয় পরস্পরের মধ্যে অতি সন্তর্পণে তৈরী খাপের সাহায্যে—যার মধ্যে একটি অপরটিকে জোরে আটকে রাখে। লা' এর মধ্যে গর্ত করে ধুরার মুখটি ঢোকানো হয়। একে বলা হয় গেলাস বা উলো ( উলুয়া )। উলুয়ার গর্তটি বাইরের দিকে ছোট, ভেতরের দিকে বড়। এই উলুয়ার গর্তের পরিমাণ তিন ইঞ্চি, খাড়াই সাত জ'। উলুয়া দুপাশে থাকে। তা'ছাড়া লা' এর দুপাশে লোহার বেড় বা রিং এর মত পাত লাগানো হয়। একে বলা হয় 'ছোট্'। একটি গাড়ির একজোড়া চাকায় চারটি উলুয়া ও চারটি ছোট্ থাকে। এভিন্ন ধুরা যাতে খুলে না আসে তার জন্য দু'পাশে অর্থাৎ লা' এর বাইরের দিকে দুটি লোহার কাঠির মত থাকে। এদের নাম 'রংখিল'। ধুরার গায়ে সরু গর্ত করে রংখিল প্রবেশ করানো হয়। রংখিলের উপরের দিক মোটা করা থাকায় তারা ঐ গর্ত দিয়ে পড়ে যেতে পারেনা। আর পুটের বাইরে দিয়ে 'হাল' নামক লোহার বেড় পরানো হয়। খড়ের বা ঘুঁটের আগুনে হাল গরম করে চারদিক থেকে সাঁড়াশির দ্বারা টেনে বড় হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে গায়ে বসানো হয়।

চাকার স্থায়িত্ব ও ভারবহন সামর্থ্য বজায় রাখবার জন্য বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রকমের কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়। হাঁড়ি বা লা' এর ওপরই সমস্তরকম ভার পড়ে। তাই সর্ব প্রথমে এইটি তৈরী করা হয়। কাঠ ব্যবহার করা হয় বাবলা ও শিরীষ। কারণ এগুলি খুবই শক্ত কাঠ। আড়া তৈরী হয় শালকাঠের। এগুলি যাতে সোজাভাবে খাড়া থাকে তাই এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। কোনরকম ভাবে বাঁকলে চলবে না। বেড় বা পুটেও হয় বাবলা কাঠের। আগে 'ধুরা' হত সুন্দরী কাঠের। এখন লোহার ধুরা তৈরী হয়। পুটের জন্য মোটা বাবলার গুঁড়ি কাঠ প্রয়োজন। কারণ একখণ্ড কাঠ থেকে চেঁচে এটি তৈরী করতে হয়। জোড়া হলে পুটের জোর হবে না।

যন্ত্রপাতি হিসাবে অতি সাধারণ কিছু কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি লাগে। তার মধ্যে প্রধান হল বাটালি ( কয়েক প্রকারের ), মাটা বাইস, রঁাদা, গ্রিন্‌কাপ, হাত কুড়ুল, হাতুড়ি ( লোহার ও কাঠের ), হাত করাত, হাড়কাঠ ( কাঠ চেরাইয়ের জন্য )। কাঠের হাতুড়ির অপর নাম দু'হাতা। বাটালিতে ধার আনতে ঘষার জন্য শিল বা কোন পাথরের পাটা জাতীয় জিনিসের প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি চাকার সকল অংশের কাঠকে যতদূর সম্ভব মসৃণ করা হয়। ভালভাবে পরিষ্কার করা না হলে চাকায় কাদা আটকে যায়। এক জোড়া চাকা সম্পূর্ণ তৈরী করতে সময় লাগে প্রায় দশ দিন। কিন্তু সে তুলনায় মজুরী এত কম যে এই শিল্পের শিল্পীরা আজ অন্য পথ খুঁজছেন।

# মাদুলি, তাবিজ, আংটির গোপন কথা

মাদুলি, কবজ, তাবিজ ইত্যাদির উপর একশ্রেণীর লোকের বিশ্বাস বর্তমান। এই সব মাদুলি ইত্যাদির মধ্যে গাছগাছড়া, মন্ত্রপূত কাগজ বা নির্দেশিত অন্য কোন জিনিস ভর্তি করে খোলা মুখটি মোম, মাটি বা অন্য কোন পদার্থ দিয়ে ভর্তি করে সুতা, হার বা অন্য কিছুর সাহায্যে হাতে, গলায় বা দেহের অন্য কোথাও বাঁধা হয়। লোকের বিশ্বাস এইসব মাদুলি ইত্যাদির ধারকের মঙ্গল হয়। মাদুলি, তাবিজ, কবজ—এসবকিছুই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং নির্মাণ পদ্ধতিও মোটামুটি একই রকম।

মাদুলি প্রভৃতি মোটামুটি পাঁচটি ধাতুর তৈরী হয়। সোনা, রূপা, পিতল, তামা ও লোহার। এ ভিন্ন অষ্টধাতুর মাদুলি নামে এক প্রকারের মাদুলিও হয়। এগুলি সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরী হয়। সোনা ও রূপার এবং অষ্টধাতুর মাদুলিগুলি সাধারণতঃ স্বর্ণকারেরা তৈরী করেন। লোহার মাদুলি তৈরী হয় বাঁকুড়ায়। কিন্তু তামার এবং পিতলের মাদুলির একমাত্র উৎপাদন স্থল হল শান্তিপুর। এখানকার তিলিপাড়া, রামনগর প্রভৃতি পাড়া এলাকায় এর কারখানা গুলি মোটামুটি সীমাবদ্ধ। তামার মাদুলির শিল্পীরা প্রয়োজনানুসারে রূপার মাদুলিও তৈরী করেন।

মাদুলি তৈরীর পদ্ধতি খুবই জটিল ও মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পেব সঙ্গে যুক্ত না থাকলে কোন ব্যক্তির পক্ষে মাদুলি সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা সম্ভব নয়। এর নির্মাণ কৌশল, গঠন বৈচিত্র্য এবং ঔজ্জ্বল্য একমাত্র শান্তিপুরের শিল্পীদেরই করায়ত্ত।

মাদুলিব সাইজ বা মাপ বিভিন্ন রকমের হয়। এর সাইজ অনুসারে একে মোট আটভাগে ভাগ করা হয়। সর্বাধিক বড় সাইজের মাদুলির মাপ অনুযায়ী নাম হল 'ন' খানা', এর চেয়ে ক্ষুদ্র সাইজের মাদুলির নাম হল 'দশ খানা'। এভাবে পরপব 'এগারো খানা', 'বারো খানা' 'তেরো খানা', 'পনেরো খানা', 'সতেরো খানা' ও 'উনিশ খানা'। 'উনিশ খানা' হল সর্বক্ষুদ্র সাইজের নাম। মাদুলিকে দেহের সঙ্গে বাঁধবার জন্য যে 'কড়া' বা 'আংটা' দেওয়া থাকে তাও কোন ক্ষেত্রে একটি বা কোনক্ষেত্রে দুটি দেওয়া হয়। এই কড়ার সংখ্যানুসারে 'এক কড়া' বা 'দু 'কড়া' হিসাবেও মাদুলির ভাগকরণ হয়। তাছাড়া মাদুলি তৈরীর 'চাদর' বা 'শীটের মোটা ও পাতলা 'দল' ( বেধ ) অনুযায়ীও ভাগ হিসাব হয়।

প্রথমেই পাতলা তামার পাত থেকে মাদুলির সাইজমত পরিমাণ তামা কেটে নেওয়া হয়। এইভাবে সমান সাইজে কাটার জন্য পূর্বেই একটি টিনের পাত বা

ঐজাতীয় কোন শক্ত জিনিস ঠিক করা থাকে। বিড়ির পাতা কাটার মত ঐ শক্ত জিনিসকে অতি পাতলা তামার পাতের ওপর রেখে কাতারির সাহায্যে পর পর কাটা হয়। কাটা তামার পাতের অংশটিকে একটি গোল কাঠির ওপর রেখে গোলাকার করা হয়। তারপর কাটা অংশের মুখ দুটিকে 'পান' মাখিয়ে রৌদ্রে বা হাওয়া যুক্ত জায়গায় শুকাতে দেওয়া হয়। পরবর্তী অধ্যায় হল এর সঙ্গে আংটা বা কড়া লাগানো। এই কড়াটি আগে প্রস্তুত করা হয়। একটি তামার তারকে টেনে লম্বা করে নিয়ে একটি নেয়াইয়ের ওপর রেখে পেটানো হয়। নেয়াইয়ের ওপর আগেই লম্বা গর্ত করা থাকে। তার ওপর পেটানোর ফলে কড়ার তারের ওপর নেয়াইয়ের গর্ত মত একটি বা দুটি দাগ পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন কড়াটিকে দেখতে সুন্দর হয়, অন্যদিকে কড়াটি শক্তও হয়। একে বলা হয় কড়ার 'জোল' দেওয়া। এইবার ঐ তার থেকে অতি স্বল্প পরিমাণ দাগ দেওয়া অংশ কেটে নিয়ে প্লাসের সাহায্যে বর্তুলাকার করা হয় যাতে কড়া বা আংটা হতে পারে। এরপর চিমটার সাহায্যে একটি বা দুইটি কড়া ঐ গোলাকার অবস্থায় মাদুলির ওপর যেখানে উভয় অংশ জোড়া হয়েছে সেই পানের ওপরে মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। পাছে ঐ কড়া খুলে যায় তাই 'কামড়ি' বা 'ক্লিপ' জাতীয় জিনিস দিয়ে আটকে রাখা হয়। এর পর মাদুলিগুলি পর পর শুকাতে দেওয়া হয়। পানের সঙ্গে ঐগুলি লাগিয়ে এইভাবে শুকিয়ে নেওয়ার পর মাদুলির একটি-দিক বন্ধ করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মাদুলির বৃত্তের সাইজে লম্বা পাত কাটা হয়। এইবার ঐ কাটা চাদরের পাতের ওপর পাতলা করে 'পান' ধরানো হয়। সেই পানের ওপর সারি সারি করে পর পর মাদুলিগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেইগুলি অল্প আটকে গেলে মাটির সরায় বালি ভর্তি করে তার ওপর অল্প কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে আগুন দিয়ে সেখানে যতগুলি সম্ভব ঐরকম মাদুলি সমেত পাত বসিয়ে দেওয়া হয় পাশাপাশি করে। এইবার ঐগুলি 'ঝালা' হয়। এইটি খুবই মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। একটি বড় কেরোসিন তেলের ল্যাম্প বা কুপি জ্বালানো হয়। ডান হাতে ছোট হাপর বা যাঁতা চালানো হয় এমনভাবে যাতে ঐ হাপরের হাওয়া কুপির শিখার মধ্য দিয়ে যায়। এই হাওয়ার ফলে শিখার আলোটি নীলবর্ণ হয়ে জ্বলতে থাকে। যথাসম্ভব হাওয়া বিহীন জায়গায় এই কাজটি করতে হয়। তাই খুবই কষ্টের কাজ। এই সময়ে বাঁ হাতে অল্পকাত করে এক একটি সরাকে ঐ নীলবর্ণ আলোর সামনে এমনভাবে ধরা হয় যাতে ঐ আগুন প্রতিটি মাদুলির গায়ে লাগে। কিন্তু বেশী তাপ লাগলেই পাতলা তামা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার অল্প তাপ হলে মাদুলির গায়ে 'পান' ধরবে না। ফলে বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরস্পরের জোড় লাগবে না। এইভাবে ঠিকমত তাপ দেওয়ার পর সরাটি নামিয়ে রাখা হয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর মাদুলিগুলির তলার লম্বা পাতটির মাদুলি

সংলগ্ন অংশ কেটে নেওয়া হয় কাতারির সাহায্যে। এভাবে ঐ পাতের উপরিস্থিত সমস্ত মাদুলিগুলিকে পরস্পরের থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এইরকম বেশ কিছু সংখ্যক মাদুলি প্রস্তুত হয়ে গেলে একটি মাটির বড় গামলা বা নাদার মধ্যে তেঁতুল জল এবং প্রয়োজন বোধে অল্প সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে সেই জলে ঐ মাদুলিগুলিকে ডুবিয়ে একটি কাঠির সাহায্যে নাড়া হয়। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ নাড়ার ফলে মাদুলিগুলির গায়ে পোড়ার দাগ নষ্ট হয়ে চক্‌চকে লালচে রং আসে। এইবার একটি ঝুড়ির মধ্যে ঐ মাদুলিগুলিকে ঢালা হয়। ঝুড়িটি মাদুলিসমেত কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার ফলে ঐ এসিড মিশ্রিত তেঁতুল জল সব ঝরে পড়ে যায়। পরে ঐ মাদুলিগুলির ওপর কাঠের গুঁড়া ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ঐ তেঁতুল জলের অবশিষ্ট অংশ যাতে কাঠের গুঁড়া শুষে নেয়। এইবার ঐ অবস্থায় শুকাতে দেওয়া হয়। শুকিয়ে যাওয়ার ফলে সব কাঠের গুঁড়া ঝরে পড়ে যায়। এইভাবে মাদুলি তৈরী সম্পন্ন হয়।

এই কাজে ছেলেমেয়েরা সকলেই যুক্ত। অল্পবয়স্ক বা শিশুশ্রমিকও প্রচুর। কিন্তু মজুরী খুবই কম। মেয়েরা প্রধানতঃ বাড়িতেই পাতকাটা, কড়াকে ছোট আংটার আকারে তৈরী ( কোঁড়া নোয়ানো ) ইত্যাদি করে থাকেন। তবে অন্যান্য পরিশ্রমের কাজ বিশেষ করে পান দেওয়ার কাজ বড় পুরুষ মানুষেই করেন।

একটি মাদুলি তৈরী করতে অন্ততঃ ১৫ বার ১৫ রকমের কাজ করতে হয়। আর এর জন্য যেমন দরকার মুন্সিয়ানা তেমনই দরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। তামার পাত ছাড়াও পান ( দস্তা, রাং, তামা ও লোহাময় সংমিশ্রণে প্রস্তুত ), তেঁতুল বা আমড়া বা ঐ জাতীয় খুব টক বস্তু, সালফিউরিক এসিড, কেরোসিন তেল, কাঠকয়লার গুঁড়া, বালি, সরা প্রভৃতি লাগে। যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক জিনিস-পত্র লাগে ১৫ / ১৬ রকমের। যেমন—কাতারি, খোঁচ, মোড়াকাঠি ( এই গুলির উপর মাদুলির তামার পাত মোড়ানো হয়। বিভিন্ন সাইজের মাদুলির জন্য বিভিন্ন রকমের কাঠি হয়), পাটি, ছোট চিমটা বা স্নান্না, কামড়ি, পানকাঠি ( মাদুলিতে পান লাগানোর জন্য ছোট কাঠি ), হাতুড়ি ( খুবই হালকা ছোট মাপের হাতুড়ি ) ঝুড়ি, নির্দিষ্ট মাপের ইঁট, মাটি, কয়লা, পিটুনি কাঠ, কাঠের গুঁড়া, সরা ও ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা। এই সব যন্ত্র ছাড়াও লাগে নেয়াই, প্লাস, জোল ( ভাইস ), উকা হামানদিস্তা ও যাঁতা বা হাপর।

এইভাবে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এক একটি উজ্জ্বল মাদুলি তৈরী হয়। তাবিজও অনুরূপভাবে হয়। তবে গঠনপদ্ধতি হয় চোকা বা লম্বা এবং কড়াগুলি সাধারণতঃ পাশে বা প্রয়োজনমত উপরে হয়।

আংটি তৈরীর পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ। আংটি মোটামুটি তিন প্রকারের হয়। খোপা আংটি, টালি আংটি ও কম আংটি। তামার তারকে আড়াই

প্যাঁচ দিয়ে গোলাকৃতি করা হয়। তার উপরে তামার তার পেঁচিয়ে খোঁপার মত করে লাগানো হয়। তাই এর নাম 'খোঁপা আংটি'। অপরদিকে আংটির ওপর দিকে টালির মত চৌকা তামা লাগানো আংটিকে 'টালি আংটি' বলে। এই টালিটি শীল্ড বা অন্যরকম আকারেরও হয়। এর উপর অনেক সময়েই মিনে করা থাকে। তাই একে আবার 'মিনে' আংটিও বলে। আর 'কর' আংটি সাধারণ একটি বেড় আকারের হয়। তাই একে অনেক সময় 'বেড আংটি'ও বলা হয়। কর আংটি বা বেড় আংটি সাধারণতঃ মাদুলি তাবিজের অনুরূপ কারণে ধারণ করলেও অপর দুই প্রকার আংটি নিছক সখের কারণে পরা হয়।

তামার মাদুলি ও আংটি শিল্প শান্তিপুরের বিশিষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ এক শিল্পকর্ম।

# শান্তিপুরের 'দোলো' চিনি

শান্তিপুরের একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল 'দোলো' চিনি। বর্তমানে যে দোলো চিনি বাজারে পাওয়া যায় তার সঙ্গে পূর্বেকার এই দোলো চিনির পার্থক্য বর্তমান। পূজার জন্য এই দোলো চিনি ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত মিলের চিনির সঙ্গে লাল দেখাবার জন্য অল্প গুড় মিশিয়ে তৈরী হয়। কিন্তু পূর্বে যে দোলো চিনি ব্যবহৃত হত তার প্রস্তুত প্রণালীও ছিল যেমন আলাদা তেমনি পার্থক্য ছিল তার স্বাদে। এই চিনির স্বাদ এত মধুর ও সুগন্ধযুক্ত ছিল যে, ঐ সময়ে পাশ্চাত্যের চায়ের টেবিলে এই চিনি অবশ্য ব্যবহার্য জিনিস হিসাবে গণ্য হত।

শান্তিপুরের সূত্রাগড় অঞ্চলে দেশী প্রথার এই চিনি প্রস্তুত হত। প্রধানতঃ খেজুর গুড় থেকে এই 'দোলো' চিনি তৈরী হত। শান্তিপুরে যে পরিমাণ খেজুর গুড় তৈরী হত তা দিয়ে সাধারণ ঘরে ব্যবহার করার মত চিনি হতে পারত। কিন্তু ব্যবসা বা রপ্তানী করার মত চিনি উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য অন্য জায়গা থেকে খেজুর গুড় আমদানী করা হত। প্রধানতঃ যশোহর-খুলনা থেকেই এই খেজুর গুড় আসত। কিন্তু শান্তিপুরের উৎপাদন পদ্ধতির সৌকর্যের জন্যই সেখানে চিনি তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠে।

একটি শিল্প পদ্ধতি অনুসরণ করে এই চিনি তৈরী হত। প্রথমে গরুর গাড়ী করে আসা খেজুরগুড়ের নাগরী গুলিকে কারখানায় কাঠের পিটনে দিয়ে ফাটানো হত। পরে ঐ ভাঙা নাগরীগুলি থেকে গুড় বের করে মশকে (মোষের চামড়ার থলিতে) রাখা হত। ভাঙা খাপরায় (নাগরীর ভাঙা টুকরায়) লেগে থাকা গুড় ছুরি দিয়ে ভাল করে চেঁচে নিয়ে মাটির পাত্রে রাখা হত। মাটিতে পড়ে যাওয়া গুড় মাটিশুদ্ধ চেঁচে তুলে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখা হত। উদ্দেশ্য যাতে ঐ ময়লা গুড় জলে গুলে যায়। পরে ঐ ময়লা কাদা থিতিয়ে গেলে উপরের গুড়গোলা জলটি আগুনে ভালভাবে জ্বাল দিয়ে গুড়টি বের করে অন্য গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত।

মশক থেকে গুড় বের করে প্রথমে বাঁশের তৈরী একটি পেতেতে ঢালা হত। পেতে অর্থাৎ বাঁশের ঝুঁড়ির ছোট সংস্করণ এই পেতেটি খুব ঘন বুননের হত না। পেতেটি অপর একটি পাত্রের উপর রাখা হত। তারপর ঐ পেতের গুড়ের উপর জলজ শেওলা চাপা দিয়ে ঐ শেওলা চাপা অবস্থায় কয়েকদিন রাখা হত। শেওলার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ গুড় থেকে জলীয় 'মাত' অংশ নীচের পাত্রে জমা হতে থাকত। এইভাবে ক্রমশঃ উপরের গুড়টি সাদা চিনিতে রূপান্তরিত হত। এই চিনিই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। ঐ শোধিত গুড় শুকনো ১নং দোলো

( দলুয়া বা দোব্ড়া ) চিনি হিসাবে গণ্য হত। বিদেশের বাজারে ঐ চিনির প্রচুর চাহিদা ছিল এবং ঐ চিনির প্রায় সবটাই বাইরে রপ্তানী হত। এইবার নিম্ন-পাত্রস্থ মাতগুড়ের উপর পুনরায় শেওলা দিয়ে রেখে তার থেকে চিনি বের করা হত। এটি হত ২নং গুড়। এটির বাজার ছিল এখানকার ময়রার দোকানে। পুরানো আমলের ময়রার দোকানে যেসব বিরাট বিরাট আকারের মাটির 'জালা' দেখতে পাওয়া যায় ঐগুলিতে সারা বছরের চিনি সংগ্রহ করে রাখা হত। ২নং চিনি বের করার পর যে মাত থাকত তাকেও পুনরায় শেওলা দিয়ে পরিশোধিত করে ৩নং চিনি বের করা হত। সর্বশেষ যে পরিত্যক্ত অংশ থাকত সেই মাতগুড় বা কোতরা গুড় দিয়ে তামাক তৈরী হত এবং গরুকে খাওয়ানোর কাজে লাগত।

যশোহর জেলার কোটচাঁদপুরই ছিল এই খেজুর গুড় সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১৮৪৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার মণ খেজুর গুড় ( একে দলুয়াও বলা হত ) শান্তিপুরে আমদানী করা হয়েছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিশপ লঙ শান্তিপুরের এই চিনি কারখানার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, 'শান্তিপুর থেকে দু মাইল পূর্বে একটি বৃহৎ চিনির কারখানা আছে।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ঐ কারখানায় রোজ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত হত এবং ঐখানে ৭০০ জন ব্যক্তি নিয়োজিত ছিল। এর আরও আগে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, শান্তিপুরের এই সব চিনি কারখানা থেকে বিলাতে প্রায় ১৪০০ মণ চিনি রপ্তানী হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদে জানা যায় যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে শান্তিপুরে একটি প্রকাণ্ড মদের ভাটি চালু আছে। এই ভাটিটি আরও আগে থেকেই বর্তমান ছিল। কারণ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে, ঐ বছরের জুলাই মাসে সরকার শান্তিপুরের কুঠির মদের ভাটির তত্ত্বাবধায়ক কাভিয়ানের মাসিক বেতন বাবদ ৫০০ টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বোঝা যায়, চিনির যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ বা গাদ উৎপন্ন হত তার থেকেই এই বিশাল মদের ভাটির কাঁচা মাল সংগৃহীত হত এবং এজন্যই ইংরেজ কোম্পানী এখানে মদের ভাটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।

এখানে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্রাচীন ব্যক্তির একটি বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য : '৪০। ৫০ জন লোকের জটলা, ছুটাছুটি, চেঁচামেচিতে কারখানা বাড়ি সরগরম থাকিত। ঠক্ ঠক্ চক্‌মকির আগুন পড়িত সোলার উপর, নাগরী ফাটিত ফটাফট্, মশকে ( মোষের চামড়ার থলিতে ) ঘা পড়িত ধপাধপ্। তামাক পুড়িত তাল তাল। কড়া ঝাঁঝালো অথচ সুমিষ্ট ধোঁয়ায় গদি ঝাপসা হইয়া উঠিত। বিলাসী মালিক উপস্থিত থাকিলে অম্বরী তামাকের সুগন্ধে গদি সুবাসিত হইত। কাঠের পিট্‌নে দিয়ে নাগরী ফাটান হইত। ভাঙ্গা খাপরায় লাগা গুড় বড় বড় মাটির পাত্রে রাখা হইত লোহার ছুরি দিয়া চাঁচিয়া যেন গুড় নষ্ট না হয়। মাটিতে এক তোলা পড়িলে

মাটি শুদ্ধ দেড়তোলা তুলিয়া জলপাত্রে দেওয়া হইত। জল থিতাইয়া তলানি কাদামাটি বাদ দিয়া পুনরায় তাহাকে জ্বালাইয়া গুড়কে পুনরুদ্ধার করা হইত। এতখানি কঠোরভাবে সাবধান না হইলে শতকরা ২ মণ লোকসান তো অনিবার্য। অপচয় সম্বন্ধে সাবধানতার জন্যই ময়রারা 'মাছি টেপা' অপবাদ লাভ করিয়াছে।'

শান্তিপুরের এই চিনি শিল্পের স্মৃতি বহন করছে একটি রাস্তা। রাস্তাটির নাম 'খাপরা ভাঙ্গা'। একসময়ে শান্তিপুরের চিনি কারখানার জন্য যে প্রচুর পরিমাণ নাগরী বোঝাই গুড় আসত সেই ভাঙা নাগরীর টুকরা (খাপ্‌ড়া) দিয়ে এই রাস্তাটি তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে ঐটি পিচের রাস্তায় রূপান্তরিত হলেও রাস্তার নামটি অবিকৃত আছে।

জাভা বা যবদ্বীপ থেকে আসা সস্তার বীট চিনি অর্থাৎ বীট থেকে উৎপন্ন চিনি এই দোলো চিনি শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। অবশ্য আখের গুড়ের চিনি শিল্প এরপরও শান্তিপুরে চালু ছিল। কিন্তু এই সময়ে কলকাতার কাছাকাছি কালীপুর অঞ্চলে দানা সম্বলিত চিনি প্রস্তুত হতে আরম্ভ করে। দেশীয় নিকৃষ্ট চিনি ও জাভার ৩ নং চিনি কিনে এই সব কারখানা আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত দানাদার চিনি তৈরী করতে থাকে। এই চিনির প্রতিযোগিতায় শান্তিপুরের চিনি পরাজিত হয়।

শান্তিপুরের এই চিনিকলের নাম ছিল 'শান্তিপুর সুগার কনসার্ন'। কলকাতার মেসার্স স্মিথ, কাউয়েল এ্যাণ্ড কোম্পানী ছিলেন এঁদের এজেণ্ট। এঁদের লণ্ডনের এজেণ্ট ছিলেন সেণ্ট হেলেন প্লেসে অবস্থিত মেসার্স স্যামুয়েল ফিলিপস্ এ্যাণ্ড কোম্পানী এবং লিভারপুলের এজেণ্ট ছিলেন মেসার্স মুরে এ্যাণ্ড কোম্পানী। পুরানো সুপ্রিম কোর্টের নথিপত্রে দেখা যায় যে, এই চিনি কলের কলকাতাস্থ এজেণ্ট মেসার্স স্মিথ, কাউয়েল এ্যাণ্ড কোম্পানী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে লণ্ডনের এজেণ্টের কাছে এক হাজার একশ চল্লিশ পাউণ্ড দশ শিলিং ছ'পেন্স মূল্যের এক হুণ্ডি দেয়। তাতে তারা স্পষ্ট করে উল্লেখ করে যে তারাই শান্তিপুর সুগার কনসার্নের এজেণ্ট। লণ্ডন কোম্পানী আবার ঐ হুণ্ডি ম্যালকম এ্যাণ্ড কোম্পানীকে দেয়। শুধু এই হুণ্ডিই নয়—এইরকম আরও অনেক হুণ্ডি তখন তারা দিয়েছিল। অন্ততঃপক্ষে ঐ সময়ে তাদের তিনটি বড় অংকের হুণ্ডি বাজারে লণ্ডন ও লিভারপুলের এজেণ্টের কাছে ছিল এবং তারা আবার অন্য কোম্পানীকে ঐ হুণ্ডি দেয়। ইতিপূর্বে তারা শান্তিপুর কোম্পানীর হয়ে আরও অনেক হুণ্ডি বাজারে ছেড়েছিল এবং সেগুলিকে যথারীতি ভাঙানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হঠাৎ লণ্ডন ও লিভারপুলের দুটি এজেণ্টই নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। এর ফলে ঐ সময়ে বাজারে থাকা সব হুণ্ডি পরিশোধের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট কলকাতাস্থ এজেণ্টের ওপর চাপিয়ে দেন। এই

আকস্মিকতায় কোম্পানীর অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ভেঙে পড়ে। শান্তিপুর চিনি কল উঠে যাওয়ার এটিও একটি বড় কারণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঐ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ৮।১০ মাসে ঐরকম ২২টি বড় বড় কোম্পানী নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। মজার ব্যাপার যে ঐ বছরেই কলকাতা বন্দর থেকে চিনি রপ্তানী হয় ১ ৭,১৫, ২১৭ মণ।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ব্যবসাদাররা সরকারকে এক আবেদনে জানান যে, ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে বছরে ৫০ হাজার মন চিনি রপ্তানী হত। এর শতকরা ৫০ ভাগ লাভ হত। কিন্তু বর্তমানে এখানে চিনির ব্যবসায়ে মন্দা চলছে। তাই এখানে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পদ্ধতিতে চিনিশিল্প গড়ে তোলা হোক্। এর ভিত্তিতে সরকার কিছু জমি শুধু আখচাষের জন্য বন্দোবস্ত দেন। কিন্তু ঐসব জমিতে উইপোকার উপদ্রব এত ছিল যে ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৯৫ সালে সরকার পুনরায় এই পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু মিঃ পিটারসন নামক এক ব্যক্তি কোম্পানীর উদ্যোগকে নিজ উদ্যোগে পরিণত করে ঐ দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৃতীয়বারের মত পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পদ্ধতি বাংলায় চালু করবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা জামাইকার ইক্ষুচাষের সঙ্গে যুক্ত রিচার্ড কাড্ডিয়ানকে শান্তিপুরের কুঠির অধ্যক্ষের অধীনে নিযুক্ত করেন। তিনি এখানকার সঙ্গে কলকাতার নৈকট্য এবং রাধানগর ও সোনামুখী থেকে জলপথে এখানে গুড় আনার সুবিধার জন্য এই জায়গাটি অর্থাৎ শান্তিপুরকে তাঁদের নতুন পরীক্ষার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই কাড্ডিয়ানই চিনিশিল্পের বর্জ্য পদার্থ দিয়ে মদ তৈরীর ভাটির প্রধান নিযুক্ত হন। এখানে তাঁদের ব্যবসা ভালই চলছিল। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনের চিনির বাজার ক্রমশঃ অস্থিতিশীল হওয়ায় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের এখানকার নতুন ব্যবসা বন্ধ করে দেন। অবশ্য এরপরও দোবরা চিনির ব্যবসা চলেছিল। ১৮০৩ সালের কোম্পানীর খাতায় 'শান্তিপুরের চিনিই সর্বোৎকৃষ্ট' বলে উল্লেখ এবং ১৮০৬ সালের বিশাল মদের ভাঁটিই তার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ১৭৮৫ সালের পর থেকেই যুক্তরাজ্যে চা খাওয়ার রেওয়াজ বেড়ে যাওয়া চিনির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ১৭৯২ সালের ১৫ই এপ্রিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডনে আরও বেশী চিনি চালানের ব্যবস্থা করেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে বাংলার চিনি শতকরা ৫৩ ভাগেরও বেশী লাভে বিক্রি হয়। আর শান্তিপুর কুঠিতে ঐ বছর শুধু চিনি শিল্পের জন্য নিয়োগ করা হয় ২০, ৫২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই।

শান্তিপুরে চিনিশিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে কোম্পানীর কমার্শিয়াল বিভাগের অফিসারদের মধ্যে বিরোধ ছিল। ১৭৯৩ সালে শান্তিপুরস্থ কুঠিয়াল প্রস্তাব দেন

যে, বিভিন্ন আখচাষী ও পাইকারদের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ গুড় বাজারদরে কোম্পানীকে দেওয়ার জন্য চুক্তি করা হোক। কিন্তু বোর্ড অব্ ট্রেড্ মন্তব্য করেন যে. এর ফলে ঐসব লোকের কৃপার ওপর কোম্পানীকে ফেলে দেওয়া হবে। তারা বাজারের সব গুড় কিনে নিয়ে ইচ্ছামত দাম বাড়াবে।

সব মিলিয়ে শান্তিপুরের চিনি শিল্প এক গৌরবময় বর্ণোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস।

## পটে আঁকা পটেশ্বরী

শান্তিপুরে নানা বিচিত্র রকমের দেবদেবী পূজা হয়। তাদের আঙ্গিক, গঠন-প্রণালী, মূর্তি পরিকল্পনা—সব কিছুর মধ্যেই বৈচিত্র্য বর্তমান। এইরকম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তি হল পটেশ্বরী। পটে আঁকা এই মূর্তি এখানকার মৃৎশিল্পীদের এক অনন্য শিল্পকর্ম। এর নির্মাণকৌশল খুবই আকর্ষণীয়। রাসের সময়ে অন্যান্য ঠাকুরের সঙ্গে এঁর পূজা হয়। শান্তিপুরের রাসে রাসকালী পূজা প্রচলিত আছে।

একটি কাঠের পাটাতনের উপর এই মূর্তি অংকিত হয়। ৬ ফুট লম্বা ও সাড়ে চারফুট চওড়া প্রায় একশ' বছরের পুরানো বার্মীজ সেগুন কাঠের তৈরী এই পাটখানি। মোট তিন টুকরা কাঠ পাশাপাশি জুড়ে এটি তৈরী হয়েছে। প্রথমে ঐ জোড়ার মুখগুলিতে এঁটেল মাটি দিয়ে পাটাতনখানি সমতল একটি পাটে পরিণত করা হয়। এবার নতুন কাপড় এঁটেল মাটিতে ভিজিয়ে সমস্ত পাটের ওপর লাগিয়ে নেওয়া হয় এবং একটু শুকিয়ে গেলে বাঁশের চেয়াড়ি ( কর্ণিকের মত জিনিস ) দিয়ে পাটাতনখানি ভাল করে মেজে নেওয়া হয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর মূর্তি তৈরীর প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে সাদা খড়ি মাটি জলে গুলে ভালভাবে সম্পূর্ণ পাটটি রং করা হয়। একে বলা হয় 'জমি' তৈরী করা। এরপর মূর্তি অংকনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়।

প্রথমেই পেন্সিলের সাহায্যে ঐ জমির ওপর মূর্তির অস্পষ্ট আলেখ্য ( আউট লাইন ) এঁকে নেওয়া হয়—শিবের ওপর কালী মাতা, দু'পাশে জয়া বিজয়া। সমগ্র মূর্তিটি আবার ঠাকুর দালানের মধ্যে অবস্থিত দেখানো হয়। দালানটি ঝালর ইত্যাদি শোভিত অর্থাৎ বিশিষ্ট বাড়িতে যেভাবে দেবীপূজা হয় সেইভাবে এই মূর্তিটি অংকিত হয়। তাই আঁকবার সময়ে প্রথমে দালানের ধাপ-কার্নিস, তারপর শিব ও তারপর কালীর আউট লাইন করে নেওয়া হয়। তারপরে দালানের বাইরে দণ্ডায়মান জয়া ও বিজয়ার দাগ টানা ( আউট লাইন ) হয়। এই সময়ে লক্ষ রাখা হয় যে, ঠাকুরের পুরো ড্রয়িং—বিশেষভাবে, হাতের এলাকা আঁকা হয়ে গেলে তবেই জয়া-বিজয়া আঁকা হবে। এইভাবে সমস্ত আউট লাইন আঁকার পর পটের রংয়ের কাজ শুরু হয়। প্রথমেই ঠাকুরের গায়ের রং দেওয়া হয় গাঢ় নীল। এর পরেই দেবীর গলায় হারের আকারে সজ্জিত, কোমরে সজ্জিত এবং হস্তস্থিত মুণ্ডমালার মূল রং হলুদ লাগানো হয়। এবার শিবের মূল রং সাদা দেওয়া হবে। এইভাবে সমগ্র পটটির মূল রংগুলি দেওয়া হয়ে গেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পাশে অর্থাৎ হাতের পাশের ছায়ার অংশগুলিতে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রং লাগানো হবে। যেখানে যেখানে এইরকম 'শেড্' দরকার সেখানেই গাঢ় রং লাগানো

হবে। এবার দেবীর চোখ আঁকা হয়। সেইসঙ্গে হাত, পা, মুণ্ডমালায় লাল রং দেওয়া হয় এবং মুণ্ডমালার চোখও এঁকে নেওয়া হয়। তারপর কালীর চুলের শেড্ কালো এবং সেইসঙ্গে মুণ্ডমালার কালো চুল আঁকা হবে। এইভাবে দেবীর গায়ের প্রাথমিক অংকনের কাজ শেষ হলে শিবের গায়ের রং শেষ করা হয়। চোখ ইত্যাদি আঁকা, সেইসঙ্গে হাত পায়ের রং এবং গলার মালায় কালো ও পরনের বাঘছাল আঁকা হয় হলুদ ও কালো রং দিয়ে। এইবার ধরা হয় ঠাকুর দালান ও তার আনুষঙ্গিক অঙ্গসজ্জা—থাম, থামের মাথার কার্নিস, প্রতি খিলানের মধ্যে ঝালর, বেলহাড়ি ইত্যাদি। এখানে প্রয়োজনানুসারে কালো, লাল, হলুদ ও সাদা রং ব্যবহার করা হয়। ইতিমধ্যেই দেবীমূর্তির গলায় সাদা রংয়ের মালা এঁকে নেওয়া হয়। এবার দেবীর সব গহনা আঁকা হয় সোনালী ব্রঞ্জ দিয়ে। লক্ষ রাখা হয় পায়ের, হাতের, গলার, আঙুলের ও মাথার মুকুট ইত্যাদি সমস্ত গহনা ঠিকমত আঁকা হয়েছে কিনা। তারপর ঠাকুরের পিছনের শেড্ হিসাবে গোলাপী রং ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে জয়া বিজয়ার রং হিসাবে হালকা হলুদ ও তার পিছনের রং হিসাবে হালকা নীল রং ব্যবহৃত হয়।

জয়া বিজয়ার মূর্তি এলোচুল, নগ্ন। দেবীর বাঁদিকে থাকে জয়া, ডান দিকে বিজয়া। জয়ার বাঁ হাতে তলোয়ার ডান হাতে ঢাল। আর বিজয়ার ডান হাতে তলোয়ার বাঁ হাতে ঢাল। ঢালগুলি এমনভাবে আঁকা হয় যাতে জয়াবিজয়ার লজ্জাস্থান ঢাকা পরে।

ঠাকুরের আকার হয় ন' পোয়া অর্থাৎ সওয়া দু' হাত। এই মূর্তিটি আঁকা হয় নৃত্যরত কালীমূর্তি অর্থাৎ বাঁকা অবস্থায়। শিবও এড়োভাবে। আকারে ন'পোয়া। অর্ধ নিমীলিত চক্ষু। জয়া ও বিজয়ার আকার একহাত করে।

এই ন'পোয়া মাপকে শিল্পী দুভাগে ভাগ করে নেয়। প্রথমে দেবীর পায়ের পাতা থেকে কটিদেশ পর্যন্ত মাপ রাখা হয় এক হাত পাঁচ আঙুল পরিমাণ। আর কটিদেশ থেকে মাথা অবধির মাপ হয় এক হাত তিন আঙুল পরিমাণ। এইভাবে ভাগ করে নেওয়ার ফলে মূর্তিটির অঙ্গ সৌষ্ঠব অপরূপ হয়। ঠাকুরের দৃষ্টি থাকে সাধারণ মানুষের দিকে সামনে। আর শিব অর্ধনিমীলিত চক্ষে কালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন এই ভাবে আঁকা হয়। এই মূর্তি আঁকতে যন্ত্রপাতি খুবই কম লাগে। অল্প মাটি, কাপড়, চেয়াড়ি, তুলি ও রং। রং-এর মধ্যে লাগে খড়িমাটি, পিউরি হলুদ, কমলা, নীল, লাল, কালো, সোনালী, হোয়াইট জিংক। এছাড়া সব রংয়ের সঙ্গে তেঁতুল বিচির 'কাই' মিশিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ রংয়ের পরিমাণের তিনভাগের এক ভাগ তেঁতুল বিচির কাই মেশানো হয়। তেঁতুল বিচিকে গুঁড়ো করে সেদ্ধ করে কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে এই কাই হয়। পটের ঔজ্জ্বল্য আনবার জন্ত কোনরকম 'গর্জন' তেল দেওয়া হয় না। এছাড়া পেন্সিল, কম্পাস

ও স্কেল ব্যবহৃত হয়। যে তুলি ব্যবহৃত হয় তা শিল্পী নিজেই ছাগলের লোম থেকে তৈরী করেন। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পী কালীপুজার বলির ছাগলের ছালের লোম থেকে ঐটি তৈরী করেন। তাছাড়া শিল্পী আরও অনেকগুলি বিধিনিষেধ মেনে চলেন। পট আঁকার সময়ে তিনি এই কদিন নিরামিষ আহার করেন। যতক্ষণ মূর্তি আঁকেন ততক্ষণ প্রস্রাব, পায়খানা, থুথু ফেলা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকেন। স্নান করে কাজে বসেন এবং পট আঁকার সময়ে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। যেখানে তিনি আঁকতে বসেন ঐ জায়গাটি পরিচ্ছন্ন করে শুদ্ধাচারে বসে আঁকেন। প্রকৃতপক্ষে নিখুঁত ও পরিপাটি অংকনের জন্য এই ধরনের সংযম প্রয়োজন।

এই পূজার উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত শোনা যায়। অনেকের মতে মুসলমান আমলে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই পটের মূর্তি সৃষ্টি করা হয়। অনেকের মতে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে এটি লুকিয়ে বনের মধ্যে পূজা করা হত। পরে জনসাধারণের গোচরে এলে তাঁরা প্রকাশ্যে পূজার ব্যবস্থা করেন। যতদূর জানা যায় বেণী পাল প্রথমে দীর্ঘদিন ধরে এই মূর্তি আঁকতেন। তাঁর অবর্তমানে যোগীন্দ্রনাথ পাল প্রায় ৭৫ বছর ধরে ঐ মূর্তি সৃষ্টি করতেন। তারপর মহানন্দ পাল দীর্ঘ দিন ধরে ঐটি করেন। পরবর্তীকালে চন্দ্রকান্ত পাল ( নস্তু ) ঐটি করতেন। এখন তাঁর ছেলেরা ঐ মূর্তি আঁকার দায়িত্ব নিয়েছেন।

যোগীন্দ্রনাথ পাল একটি ছোট প্রতিলিপি নমুনা হিসাবে করে রেখেছিলেন। পরে ঐ প্রতিলিপির ওপর আরও একবার রং ধরিয়েছিলেন। ঐ ছবিতে দেখা যায় জয়া বিজয়া বসা অবস্থায়। মনে হয় ওদের নগ্নতা ঢাকবার কারণে ঐ বসা মূর্তি অংকিত হয়। কিন্তু বর্তমানে দাঁড়ানো জয়া বিজয়া আঁকা হয়। তাছাড়া বর্তমানে এই মূর্তির মাথার দিকে চালচিত্র আঁকা হয়।

বাংলার পটশিল্পের ইতিহাসে শান্তিপুরের এই পটেশ্বরী এক অনন্য কীর্তি।

# চাদর পিতলের কাজ

কথিত আছে, রাণী ভবানী তাঁর বড়নগরের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণের পরে বলেছিলেন যে, 'আমার মন্দিরের দেবতার প্রভাত-বন্দনার জন্য কোনো নহবৎ বাজানোর প্রয়োজন হবে না। কাঁসারীদের হাতুড়ির শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙবে'। দেবতার ঘুম ভাঙুক বা না ভাঙুক এই প্রবাদ থেকে সেকালের বাংলায় কাঁসা পিতল শিল্পীর বিস্তার ও প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার অন্যান্য অনেক জায়গার মত সারা নদীয়া জেলাতেও এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ছিল। আবার তারমধ্যে তিনটি জায়গায় প্রস্তুত বিশেষ কয়েকটি জিনিস স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য আজও স্মরণীয়। এই জেলার মুড়াগাছা অঞ্চল কাঁসার গ্লাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার আধসেরী বা এক পোয়া গামছা-মোড়া ও খেজুরছড়ি গ্লাস দীর্ঘদিন ধরে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জলপিপাসা নিবারণের একমাত্র পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। নবদ্বীপে তৈরী হত কাঁসার রেকাব বা ডিস। ছোট, বড়, মাঝারি—নানা আকারের পদ্মকাটা, সাধারণ বা মাটা অথবা নকশাকাটা ডিস একদা বাঙালীর জলখাবারের পাত্র হিসাবে বা বিবাহাদি ব্যাপারে স্বল্প উপহার হিসাবে দেওয়ার অন্যতম প্রধান বস্তু ছিল। অনেক সুখস্মৃতির স্মারক হিসাবে এখনও কারো কারোর বাক্স-পেটরার মধ্যে দু' একটি কাঁসার ডিস দেখতে পাওয়া যাবে। অপরদিকে শান্তিপুরের বৈশিষ্ট্য ছিল পিতলের ঢালা মূর্তি নির্মাণের ও চাদর বা শীট পিতলের ঠিলি অর্থাৎ ছোট ঘড়া এবং ছোট ঘটি নির্মাণের। এছাড়াও নির্মিত হত কমণ্ডলু। পুণ্যার্থী গঙ্গাস্নানকারীদের হাতে এখনও যে পবিত্র জলবাহী কমণ্ডলু দেখা যায় অথবা পল্লীবাংলার ঘরে ঘরে পানীয় জল রাখবার জন্য যেসব ছোট ঘড়া ব্যবহৃত হয় কিংবা ঠাকুর পূজার ঘট হিসাবে প্রয়োজনীয় ছোট ঘটি এসবই শান্তিপুরে তৈরী হত। এখনও তৈরী হয়। তবে যুগের পরিবর্তনে, বিকল্প বস্তুর প্রচলনে এবং পিতলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে অন্যান্য অনেক কুটিরশিল্পের মত এই শিল্পটিও মৃতপ্রায়।

প্রতিটি কুটিরশিল্পের মত এই চাদর পিতলের জিনিস নির্মাণেও এক ধরণের মুন্সিয়ানার প্রয়োজন—যা দীর্ঘদিনের আয়াসে শান্তিপুরের কাঁসারী শিল্পীরা আয়ত্ত করেছিলেন। বংশপরম্পরায় সঞ্চিত এই মুন্সিয়ানা আর উত্তরসূরীরা গ্রহণ করবে কিনা সেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এই কাজের প্রধান কাঁচামাল হল পিতলের চাদর বা শীট। এইসব চাদর থেকে প্রয়োজনমত অংশ কেটে নিয়ে তাকে পিটিয়ে গড়িয়ে নিয়ে উদ্দিষ্ট জিনিসটি তৈরী করা হয়। এই চাদর সাধারণতঃ ৪ ফুট × ৪ ফুট মাপের হয়।

এক একটি চাদরের ওজন মোটামুটি ১৪ কেজি। কলকাতার বাজার হ'ল এই চাদর সংগ্রহের প্রধান জায়গা। এই চাদর থেকে শিল্পী বা গড়নদার প্রয়োজনমত অংশ গোল করে কেটে নেয়। ঠিলিগুলি সাধারণতঃ একসেরা, তিন পোয়া, আড়াই পোয়া ও আধসেরা মাপের হয়। যে পরিমাণ জলীয় পদার্থ ঐ ঠিলিগুলিতে ধরে সেই পরিমাণের নামানুসারে এগুলির নামকরণ হয়েছে। ছোট ঘটিগুলি একপোয়া ও আধপোয়া মাপের হয়। তাই তাদের নাম পাউলি বা আধ পাউলি। প্রতিটি ঠিলি বা ঘটির মোট তিনটি অংশ থাকে। এই অংশগুলিকে জুড়ে পূর্ণরূপ দেওয়া হয়। এই অংশ বা টুকরাগুলির নাম যথাক্রমে তলা, পেট ও গলা। নীচের থেকে মাঝ পর্যন্ত অংশ তলা, মাঝ থেকে গলার শুরু পর্যন্ত অংশ পেট এবং গলার শুরু থেকে মাথার শেষ পর্যন্ত অংশ গলা। এইখানেই গলার অংশের শেষপ্রান্তটি বাঁকিয়ে কাঁধা বা কানা তৈরী হয়ে থাকে।

পিতলের চাদর থেকে প্রতিটি জিনিসের জন্য তিনখানা করে গোল চাকি কেটে নেওয়া হয়। এই কাজের তাগিদে মাপ অনুযায়ী দাগ দেওয়ার জন্য দেশীয় প্রথায় নির্মিত দুটি লোহার হাতবিশিষ্ট কম্পাস ব্যবহার করা হয়। পরে কাতারির সাহায্যে এগুলি কেটে নেওয়া হয়। এইরকম চাকিগুলির মধ্যে তলা ও পেটের চাকি একই মাপের হয়। গলার জন্য ব্যবহৃত চাকি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। তিনটি চাকির গড়নের পর একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন মাপের ঠিলি বা ঘটির জন্য বিভিন্ন মাপের চাকির প্রয়োজন। এই ব্যাপারে শিল্পীদের নিজেদের একটি মাপ আছে। সেই মাপ অনুযায়ী চাকি কাটা হয়। মাপটি এইরকম : একসেরা ঠিলির তলা ও পেটের চাকি হবে ১০ ইঞ্চি বৃত্তের। এক একটি শীট থেকে চাকি বের হবে ২৫ খানা। গলার চাকি হবে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ। তিনপোয়া ঠিলির তলা ও পেটের চাকি ৯ ইঞ্চি। গলার চাকি সওয়া ৫ ইঞ্চি। একখানি শীট থেকে ৩০ খানি চাকি বেরোবে। অনুরূপভাবে আড়াই পোয়াতে দুখানি চাকি লাগবে ৮ ইঞ্চির, গলার চাকি ৫ ইঞ্চি। চাকি হবে ৩৫ খানা। আধসেরার তলা ও পেটের চাকি হবে ৭ ইঞ্চি। গলার চাকি সাড়ে ৪ ইঞ্চি। চাকি হবে একটি শীট থেকে ৪০ খানা ইত্যাদি।

এইবার চাকিগুলিকে হাপরে গরম করে নেয়াইয়ের ওপর রেখে ঘা মেরে মেরে খাল বা গর্ত করা হয়। এক একটি চাকিকে দরকার মত খাল বা গর্ত করতে তিন থেকে চারবার গরম করতে হবে। যে নেয়াইয়ের ওপর রেখে ঘা মেরে চাকিটিকে অর্ধ গোলাকার করা হয় সেই নেয়াইয়ের মাথায় ৩ ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত অর্থাৎ গোলাকার করে খাল করা থাকে। তাতে চাকিটিকে খাল করার সুবিধা হয়। এই-ভাবে চাকিগুলি প্রয়োজনমত গোল হয়ে গেলে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া হয়। দুটি সমান আকারের চাকির মধ্যে যেটি পেটে অর্থাৎ ওপরে দিকে লাগানো হয় সেটির

মধ্য অংশ থেকে কিছু পরিমাণ চাদর কাতারির সাহায্যে গোল করে বাদ দেওয়া হয় গলা জোড়ার জন্য। গলার চাকির যে দিকটি পেটের সঙ্গে লাগানো হয় তার মুখের দিক ছোট ও উপরের দিকে সাধারণতঃ বড় করা হয়। গলা জোড়ার আগে গলার মাথার দিকের অল্প অংশ গজের সাহায্যে অর্থাৎ গজের ওপর রেখে হাতুড়ির ঘা দিয়ে বাঁকিয়ে কাঁধা বা কানা তৈরী করে নেওয়া হয়। গলার নীচের অল্প বাড়তি অংশ পেটের ওপরের দিকের গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে জোড়া লাগানো হয় যাতে গলা পেট থেকে ছেড়ে বা খুলে না যায়।

জোড়ার জন্য 'পান' দিয়ে ঝালা হয়। রাংঝালের মত বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সঙ্গে তাতাল গরম করে জোড়া হয়। এই ঝালার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় 'পান' শিল্পীরা নিজেরাই তৈরী করেন। সাধারণতঃ ৩৭৫ গ্রাম দস্তা, ১ কেজি পিতল ও ২০ গ্রাম রাং মিশিয়ে এই পান তৈরী করা হয়। কিন্তু পেটের অংশ দুটি জুড়তে আরও একটু শক্ত পান লাগে। এই জায়গা বেশী করে পেটানোর প্রয়োজন হয়। পান নরম থাকলে জোর ঘা সহ্য করতে পারবে না—জোড়া ছেড়ে যাবে। সেইজন্য এই পান তৈরীর সময়ে দস্তার পরিমাণ কমিয়ে ১০০ গ্রাম দেওয়া হয়। গলার পান নরম হলেই চলে। কারণ এখানে বেশী ঘা মারার দরকার হয় না। এ ভিন্ন 'টোলপান' বলে আর একরকম পান ব্যবহার করা হয়। সেখানে রাং দেওয়া হয় ১০০ গ্রাম। যেসব জায়গায় 'ঝাল' দেওয়া হবে সেখানে উপযুক্ত সোহাগা ও পান গুঁড়িয়ে লাগিয়ে দিয়ে গরম তাতাল চালাতে হয়। সোহাগা না থাকলে পান পিতলের গায়ে ধরবে না—ছিট্‌কে যাবে।

এইভাবে ঠিলি, পাউলি ইত্যাদি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তাকে কুঁদে পরিষ্কার করে বাজারজাত করা হয়। কমণ্ডলুও মোটামুটি এইভাবে হয়। তবে কমণ্ডলুতে অতিরিক্ত হিসাবে তলার খুরা, ওপরে হাতল এবং পাশে মুখ বা নল লাগানো হয়। এছাড়া অনেক সময়ে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য কমণ্ডলুর মধ্যে তামার পাত বা কাঠজাতীয় জিনিস লাগানো হয়। হাতল ও নল চাদর পেতলের অথবা ঢালা পিতলের হয়।

সকল প্রকার কাঁসা পিতলের কাজে যন্ত্রপাতি প্রায় একই রকমের লাগে। চাকিগুলিকে থাল বা গোলবৃত্তাকার করবার জন্য যে নেয়াই ব্যবহার করা হয় তা প্রধানতঃ দু'প্রকার—থাল নেয়াই ও মাথা নেয়াই। ঘা দেওয়ার জন্য কয়েক প্রকারের হাতুড়ির প্রয়োজন হয়। যথা—মোকা হাতুড়ি, থালা হাতুড়ি, দেড়মোকা হাতুড়ি, হুড়িমারা হাতুড়ি, ইত্যাদি। গজ ও শাবলের সাহায্যে কানা তৈরী হয় এবং গলা, পেট ইত্যাদি ঘা মেরে সমান আকারে আনা হয়। সাধারণতঃ মাটা গজ, কানারি গজ, গোল শাবল, ঢেঁকি শাবল এইসব কাজের জন্য দরকার লাগে। এ ছাড়া কামা সাঁড়াশি, হাঁড়ি সাঁড়াশি প্রভৃতি নানা মাপের সাঁড়াশি, তাতাল,

কুঁদ, নোয়ালি, উঁকা, হাপর প্রভৃতি ত' লাগেই।

শিল্পী বা গড়নদারেরা সকলে কাঁসারী হলেও কাঁসা-পিতলের অন্যান্য কাজের মত সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষরা এই চাদর পিতলের কাজে কারিগর বা সহযোগী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে রাধা বাউড়ি, পঞ্চু বাড়ড়ি, পূর্ণ জেলে, যতীন জেলে, পাঁচু মালো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শিল্পী বা গড়নদারদের মধ্যে দেবেন দাস, হাবুল দত্ত, সুধাময় দাস, সত্য দাস, নিতাইপদ দত্ত, রাধিকা নাথ প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। এঁরা সকলেই কাঁসারী ছিলেন। সারা বাংলার বাইরে এঁদের কাজের চাহিদা ছিল। অনেকেই কলকাতার নতুন বাজার এলাকায় কারখানা খুলেছিলেন। কমণ্ডলু নির্মাণের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন গৌর দত্ত।

# সোনার গৌরাঙ্গের কারুকৃতি

চৈতন্যদেব বাংলায় ইতিহাসের অন্যতম প্রাণ পুরুষ। স্বভাবতঃই সমগ্র দেশে তাঁর স্মরণে প্রচুর মূর্তি প্রস্তুত হয়েছে। এইরকম একটি মূর্তি নবদ্বীপের সোনার গৌরাঙ্গ। এই অপরূপ সুষমামণ্ডিত মূর্তিটির নির্মাণ-কৌশল তথা ঐ শিল্পকর্মের সামগ্রিক রূপরেখা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

নবদ্বীপে সেবিত এই মূর্তিটি সাধারণের কাছে 'সোনার গৌরাঙ্গ' বা সোনার তৈরী মূর্তি হিসাবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অষ্টধাতু নির্মিত একটি মূর্তি। 'অষ্টধাতু'র অর্থ হল, আটটি ধাতু মিলিয়ে তৈরী সংকর ধাতু। এর মূল ধাতুগুলি হল : সোনা, রূপা, তামা, রাং, দস্তা, সীসা, লোহা ও পারা। কোন কোন ক্ষেত্রে দু' একটি ধাতু পরিবর্তন করা হয়। যাই হোক্ এইসব ধাতুর মধ্যে পিতল ধাতু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে মূর্তি নির্মাণ করা হয়। সেইজন্য দেখতেও খুব উজ্জ্বল পিতলের মত দেখায়। তাই অষ্টধাতুর মূর্তিকে সাধারণভাবে পিতলের মূর্তি হিসাবে গণ্য করা যায়।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে শান্তিপুরের ব্রজলাল দাস নামে এক কাঁসারী শিল্পী এটি নির্মাণ করেন। সম্পূর্ণ একখণ্ডে ঢালাই করা মূর্তি। এর নির্মাণশৈলী ও মূর্তিমাধুর্য আজও সকলের কাছে আকর্ষণীয়।

এই ধরনের মূর্তি ঢালাই শান্তিপুরের সমগ্র শিল্পী সমাজের খুবই শ্লাঘার ও কৃতিত্বের স্মৃতি বহন করছে। বর্তমানে পিতলের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি, সাধারণের রুচির পরিবর্তন এবং কৃত্রিম জিনিসের প্রচলন এই শিল্পকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বর্তমানের সামাজিক পরিবেশে এইসব মূল্যবান ধাতব-মূর্তি চোর প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব দেখে ইচ্ছুক ব্যক্তিরাও আর এইসব মূর্তি নির্মাণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না অথবা সংক্ষিপ্ত ও ছোট মূর্তি, তাদের বাহন ও অঙ্গভূষণ এবং পূজার উপকরণাদি তৈরী করাচ্ছেন। ফলে এই শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ক্রম বিলীয়মান।

মূর্তি ঢালাইয়ের কাজ কয়েকটি ধাপে বা দফায় সম্পন্ন হয়। প্রথমে যে মূর্তিটি তৈরী হবে তার একটি মাটির মডেল বা অবয়ব তৈরী করা হয়। ছোট মূর্তির ক্ষেত্রে অনেকসময়ে কাঠের মূর্তিও তৈরী করা হয়। এগুলি স্থানীয় কুমোর বা ছুতোররাই তৈরী করেন। তাঁদের তৈরী এই মূর্তির ভালোমন্দের ওপরই ঢালাই মূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠব মোটামুটি নির্ভর করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শান্তিপুরের কুমোরেরা তাঁদের নির্মাণ পারিপাট্যের জন্য খুবই বিখ্যাত। বর্তমান কলকাতার কুমোরটুলির অধিবাসীদের

এক বৃহদংশের আদি নিবাস ছিল শান্তিপুর।

প্রথমে ঐ মডেল বা অবয়বের ওপর মাটি দিয়ে তার গায়ে টিপে টিপে একটি ছাঁচ তৈরী করা হয়। মাটির মডেলের ক্ষেত্রে তার ওপর খুব সূক্ষ্ম সুরকি সাধারণতঃ কাপড়ের মধ্যে বেঁধে পাউডারের মত 'থুপ থুপ' করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কাঠের মডেল বা কোন ধাতব মডেলের ক্ষেত্রে তার ওপর আগে তেল জাতীয় জিনিস মাখিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য যাতে ছাঁচের মাটি মডেলের গায়ে আটকিয়ে না যায় এবং ছাঁচটি অক্ষত অবস্থায় তুলে নেওয়া যায়। এই কাজটি খুবই নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়। এর নাম 'ছাঁচগড়া'। চলতি ভাষায় অনেকক্ষেত্রেই 'ছাঁচকাড়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই ছাঁচের মাটি প্রধানতঃ বেলেমাটি। সেই মাটির সঙ্গে পাট কেটে মিশিয়ে নেওয়া হয় যাতে মাটি ছেড়ে না যায়। বড় বড মূর্তির ছাঁচ একসঙ্গে করা সম্ভব নয় ভেবে সম্পূর্ণ মূর্তিটির ছাঁচ কয়েকটি টুকরো করে তৈরী করা হয়। টুকরো টুকরো বা সম্পূর্ণ ছাঁচ—সবই আবার দুভাগে ভাগ করে তোলা হয়। সামনের অংশ আর পিছনের অংশ সম্পূর্ণ আলাদা করে দুভাগে তৈরী করতে হয়। এরপর এই ছাঁচ রৌদ্রে এবং প্রয়োজন অনুসারে উনুনের ওপর টিনের পাত রেখে তার ওপর দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর এই টুকরোগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগ করে পূর্ণমূর্তির ছাঁচের রূপ দেওয়া হয়। এইরকম ছাঁচ জোড়া দেওয়ার সময়ে যে মাটি ব্যবহার করা হয় তা সাধারণতঃ দো-আঁশ। ঐ মাটির সঙ্গে পাট ও তুষ মিশিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া এইসব জোড়ার জায়গায় পুরানো কাপড়ের টুকরো বা ন্যাকড়া লেপে দেওয়া হয় যাতে জোড়া ছেড়ে না যায়। ছাঁচের পিছনে একটি এবং তলায় অর্থাৎ পায়ের পাতার নীচের অংশে একটি বা বেশী ফুটো বা গর্ত রাখা হয়। মুচির মধ্যে প্রয়োজনমত পিতল দিয়ে সেই মুচি ছাঁচের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয় ছোট মূর্তির ক্ষেত্রে। ছাঁচের পায়ের পাতার অংশের নীচে এই মুচি যুক্ত হয়। তার ওপর মাটির প্রলেপ ভাল করে লাগানো হয়। উদ্দেশ্য, মুচি যাতে ছাঁচের সঙ্গে লেগে থাকে—আগুনে গরম করার পর খুলে না যায়। কিন্তু বড় মূর্তির ক্ষেত্রে এইসব মুচি ছাঁচের সঙ্গে জোড়া হয় না। মুচিগুলির মধ্যে হিসাবমত পিতল তৈরীর অপর ধাতু ভর্তি করে সেগুলি অর্থাৎ মুচিগুলিকে আলাদাভাবে গলানো হয়।

মুচি হল মাটির তৈরী পাত্র। দেখতে অনেকটা ঘটির আকার। কিন্তু তলার দিকটি এতই গোল করা হয় যে, মাটিতে সোজাভাবে বসানো যায় না। রাখলেই উপুড় হয়ে যায়। এঁটেল মাটির সঙ্গে তুষ মিশিয়ে নিয়ে মুচি তৈরী করা হয়। হাতের পাতা ও আঙ্গুলের সাহায্যে মাটির তালকে টিপে টিপে পাত্রের আকার দেওয়া হয়। মাটির ( কোন কোন ক্ষেত্রে কাঠের ) গোলাকার খণ্ডের ওপর রেখে কাঠের হালকা মুগুরের সাহায্যে পিটিয়ে পিটিয়ে তলার গোল অংশটি তৈরী হয়।

সাধারণতঃ ছোট ছেলে বা অপটু কারিগরেরা এই কাজ করে। তবে ভালো মুচি তৈরী করা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। বিশেষ করে বড় মুচিতে অনেক ভারী পিতল গলানো হয়। যাতে মুচি সেই ভার ও উত্তাপ সহ্য করতে পারে সেইভাবে এটি তৈরী করতে হয়। ব্যবহারের আগে ঢালাই শিল্পী মুচি ভালভাবে পরীক্ষা করে নেয়। মুচিগুলি সাধারণতঃ রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নেওয়া হয়।

এরপর এগুলিকে খুবই বড় আকারের উনুনের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। ছোট ছোট মূর্তির ক্ষেত্রে মুচির মধ্যে প্রয়োজনমত তামা ও দস্তা অথবা পুরানো পিতল দিয়ে ছাঁচের সঙ্গে একত্রে জুড়ে ঐ উনুনে গলতে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ সময়ের ব্যবধানে ঐ মুচি শুদ্ধ ছাঁচ সাঁড়াশি দিয়ে তুলে উপুড় করা হয়। ছাঁচের তলার ফুটো দিয়ে গলিত তামা ও দস্তা অথবা পুরানো পিতল নতুন পিতলে রূপান্তরিত হয়ে ছাঁচের ফাঁপা অংশ ভর্তি করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জমে গিয়ে ছাঁচ অনুযায়ী মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে। যেহেতু বড় মূর্তির ছাঁচ ঐভাবে মুচিশুদ্ধ উপুড় করা সম্ভব নয় তাই ঐসব মূর্তির ক্ষেত্রে মাটিতে গর্ত করে ছাঁচটির মাথা নীচের দিকে করে বসিয়ে দেওয়া হয়। দুপাশে মাটির চাপ থাকায় ঢালাই-এর পর পিতলের ওজনে ছাঁচ ফেঁসে যেতে পারে না। এক বা একাধিক বড় উনুনে বড় বড় মুচিতে পিতল গলতে থাকে। মুচির মুখ খোলা থাকায় গলা পিতল দেখা যায়। অনেকজন কর্মী একই সঙ্গে প্রস্তুত থাকে। আগেই ঠিক করে নেওয়া হয় কার পরে কে মুচি ঢালবে। বড় মুচির ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক মিস্ত্রী একটি মুচি ধরে। সেইমত পর পর মুচিগুলি উনুন থেকে তুলে ছাঁচের মধ্যে ঢালা হয়। ছাঁচ মাটিতে গর্তের মধ্যে বসাবার সময়ে মূর্তির মাপের চেয়ে অল্প বেশী করে গর্তে বসানো হয় যাতে ছাঁচ বসানোর পরও উপরের দিকে কিছু অংশ খালি থাকে। গর্তের ঐ অংশের মধ্য দিয়ে গলা পিতল ছাঁচের মধ্যে যাওয়ার জন্য ঢালা হয়। মুচি দুর্বল হলে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মুচি তৈরীর সময় যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হয়। এসব বড় মুচির মুখ খোলা থাকে। গলা পিতল দেখা যায় এবং ভেতরে সৃষ্ট গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে। ছোটমুচির সঙ্গে যেখানে ছাঁচ একসঙ্গে জোড়া থাকে সেখানে মুচির ওপরদিকে একটি ফুটো থাকে যাতে 'দম' (গ্যাস) বেরিয়ে যেতে পারে। এই কাজের জন্য ব্যবহৃত বড় বড় উনুনগুলির নাম 'জাল' বা 'আউট'। যে সাঁড়াশি দিয়ে মুচি ধরা হয় সেগুলিও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। এদের হাতলগুলি খুবই লম্বা। উনুনের আঁচ ও গলা পিতলের তাপ থেকে বাঁচবার জন্য এই ব্যবস্থা। তাছাড়া ছোট হাত-সাঁড়াশির হাতলগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে কোন জিনিস ধরা হয়। এসব কাজের সাঁড়াশির হাতলগুলি পরস্পরের আরও দূরে সরিয়ে মুচি ধরা হয়। যে পরিমাণ ওজনের মূর্তি হবে তার

চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণের পিতল গলানো হয়। কারণ জ্বালতি হিসাবে কিছু অংশ নষ্ট হয়ে বা পুড়ে যায়। তাছাড়া বেশী পরিমাণ গলা পিতল ছাঁচের গর্তে ঢালা হয় যাতে অধিক চাপে তলার গলা পিতল ভাল ভাবে ছাঁচের মধ্যে যেতে পারে। তা না হলে মূর্তির অংশবিশেষ 'ছেড়ে' যেতে পারে অর্থাৎ না জমতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূর্তিটি আবার ভেঙ্গে নতুন করে ছাঁচে ঢালার প্রশ্ন থেকে যায়। তবে অল্প অংশ এভাবে না জমলে অনেক সময়ে জোড়া দেওয়া হয়।

উজ্জ্বল ও ভাল পিতল তৈরী করতে তামা ও দস্তার পরিমাণ কমবেশী করা হয়। সাধারণতঃ ভাল পিতল তৈরী করতে ১৭ ভাগ তামা ও ১৫ ভাগ দস্তা লাগে। আবার অনেকক্ষেত্রে ৬ ভাগ দস্তা ও ৫ ভাগ তামা লাগে। তবে তামা বেশী দিলে রং ভালো হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চাদর বা শীট্ পিতল তৈরী করতে লাগে ১৮ ভাগ তামা ও ৪ ভাগ দস্তা। কাঁসার ক্ষেত্রে ১৫ ভাগ রাং ও ১৭ ভাগ তামা। আবার কাঁসা তৈরীর সময়ে রাং কম দিয়ে তামা ও দস্তা বেশী দিলে এক নিম্নশ্রেণীর কাঁসা হয়। এটিকে 'ভরণ' বলা হয়।

বড় বড় মূর্তি ঢালাইয়ের আগে কিছু কিছু মঙ্গলাচরণ করে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ পরিবারের মেয়েরাই এটি করেন। তবে বড় দেবদেবীর মূর্তি ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে খরিদ্দারের ইচ্ছায় এবং শিল্পীর সম্মতিতে পুরোহিত ডেকে পূজা ইত্যাদি করে নেওয়া হয়। 'জ্বাল' বা উনুনকে পূজা করা হয়। আসলে যাতে ঠিকমত ঢালাই কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যেই এইসব পূজা ও মঙ্গলাচরণের ব্যবস্থা। অনেক সময়ে পুরোহিত নির্দেশিত সময় বা 'ক্ষণ' অনুযায়ী উনুনে আগুন দেওয়া হয়। মূর্তি ঢালাইয়ের সময়ে উৎসুক পরিবারের লোকদের ও পাড়াপড়শির উপস্থিতি লক্ষণীয়। মূচি ফেঁসে যাওয়া বা গলা পিতল থেকে খুবই মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নির্বিঘ্নে জ্বালঢালা সমাপ্ত হলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অনেক সময়ে মূর্তিকর্তার ইচ্ছা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ধাতু বেশী দেওয়া হয়। প্রায় দেখা যায় বড়মূর্তির মালিকরা মুখমণ্ডলে ও পদযুগলে সোনার অংশ বেশী দিতে আগ্রহী হন। সেক্ষেত্রে যে মূচিটি প্রথম ঢালা হবে সেইটিতে মুখের জন্য ও যে মূচিটি শেষে ঢালা হবে সেইটিতে পদযুগলের জন্য সোনা দিয়ে দেওয়া হয়।

ঢালাই হয়ে যাওয়ার পর ছাঁচগুলি ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হতে মূর্তির পরিমাণ অনুসারে কমবেশী সময় লাগে। কিন্তু সম্পূর্ণরকম ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত সাধারণতঃ ছাঁচ নড়ানো হয় না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঘা মেরে মাটির ছাঁচ ভেঙে ফেলা হয়। যেখানে ছাঁচের সামনের ও পেছনের দুটি দিক জোড়া হয় সেই জোড়ার দাগ বরাবর কিছু বাড়তি অংশ জমে। এটিকে বলা হয় 'চুয়া'। সেইরকম ছাঁচের নীচু দিকে অর্থাৎ পায়ের দিকে ঢালাইয়ের বাড়তি পিতল জমে

থাকে। একে বলা হয় 'ভাটা' বা 'নাল'। কিছুটা হাতুড়ির ঘায়ে ও বাকী অংশ উকার সাহায্যে মূর্তির গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এর পর নোয়ালির সাহায্যে চেঁচে মূর্তিটিকে পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং পরে নাক, মুখ ইত্যাদি খোদাই করে এর পূর্ণরূপ দেওয়া হয়।

মূর্তি ছাড়াও পিলসুজ, পঞ্চপ্রদীপ, ঘণ্টা, গ্লাস প্রভৃতিও এই একই পদ্ধতিতে ঢালা হয়। তবে পিলসুজ, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদির কয়েকটি অংশ সম্পূর্ণ আলাদা করে তৈরী করে পরে প্যাঁচ কেটে একত্রে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। আধুনিককালের ইলেকট্রিক লাইটের ব্রাকেট, রকমারী ফুলদানী প্রভৃতিরও প্রস্তুত প্রণালী একই-রকম। তবে এইসব জিনিস একই প্রকারের ও আকারের অনেকগুলি তৈরী হয় বলে ধাতব মডেল থেকেই ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়। এভিন্ন মোমের ও বালির ছাঁচের কোন কোন জিনিস তৈরী হয়। মোমের মূর্তি তৈরী করে তার ওপর মাটি মোটা করে লেপে দেওয়া হয়। ছাঁচের পায়ের তলা বা পিঠের দিকে ফুটো থাকে। মাটি শুকিয়ে গেলে তাপ দিলেই মোম গলে বেরিয়ে যায় ও একখণ্ড একটি ছাঁচ তৈরী হয়ে যায়। বালির ছাঁচের ক্ষেত্রে ভালো পরিষ্কার বালির সঙ্গে তেল জাতীয় জিনিস মিশিয়ে একটু আঠালো করা হয়। এবার মডেলের ওপর একটু ফাঁক করে আর একটি লোহার ঢাকা দেওয়া হয়। এই ঢাকা ও মডেলের মধ্যের অংশ তৈরী করা বালি দিয়ে চেপে চেপে ভর্তি করা হয়। পরে মডেলটি সরিয়ে নিয়ে ঐ অংশটিতে ঢালা হয়। এসব ছাঁচও আধাআধি হয় যাতে মডেলটি বের করা যায়। তবে ওপরের লোহার আস্তরণটি আবার এক করে দিলে ছাঁচটিও এক হয়ে যায়। তখন ঢালা হয়। ছোট ছোট মূর্তি, বাটি প্রভৃতি এইভাবে করা হয়। মোম বা বালির ছাঁচের সুবিধা হচ্ছে যে ঐ মোম বা বালি বার বার ব্যবহার করা যায় এবং তাড়াতাড়ি ছাঁচ তৈরী করা যায়।

এভিন্ন কাঁসা পিতল শিল্পীদের আর দুটি শিল্পকর্ম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটি হল শীট্ বা চাদর পিতলের কাজ। প্রধানতঃ ঘড়া (ঠিলি), ঘটি, কমণ্ডলু এবং নৈবেদ্যের থালা ইত্যাদি তৈরী হয়। কমণ্ডলুর নল ও হাতল অনেক ক্ষেত্রেই ঢালা পিতলের হয়। নল ছাঁচের সাহায্যে ঢালা হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে বালি পুরে দু'মুখ বন্ধ করে প্রয়োজন মত বাঁকানো হয়। এর জন্য এটিকে আবার গরম করা হয়। অনেক সময়ে কমণ্ডলুর মধ্যে তামার অংশ জুড়ে দেওয়া হয় সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য। অপর শিল্পকর্মটি হল কাঁসার ডিস, রেকাবী, থালা, বাটি ইত্যাদি প্রস্তুত। প্রথম কাঁসার একটি ঢালা পাতলা পিণ্ডাকার টুকরা করা হয়। তারপর সেটিকে গরম করে হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে বড় করা হয়। একজন হাপরে সেটিকে গরম করে সাঁড়াশি দিয়ে নেয়াইয়ের উপর ধরে। অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি ক্রমাগত ঐ পিণ্ডটির ধারে ঘা মেরে বড় করতে থাকে। এইভাবে

পিণ্ডটি পাতলা চাদরের আকার পেলে ইচ্ছামত ঘা মেরে থালা, ডিস বা বাটির আকার দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ঐ পিণ্ডটিকে গরম করে ও সাঁড়াশি দিয়ে নেয়াইয়ের ওপর ধরে থাকে সে নিয়মিতভাবে একটু একটু করে পিণ্ডটিকে ঘোরাতে থাকে যাতে সকল দিকেই সমান ঘা পড়ে। তারপর চেঁচে পরিষ্কার করা হয়।

ঢালাই শিল্প মূলতঃ কাঁসারীদের একচেটিয়া হলেও সমাজের অন্যশ্রেণীর লোকও এর সঙ্গে যুক্ত। সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত লোকেরা যথা হাড়ি, নিকারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা এর বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন। এসব লোক প্রধানতঃ মুচি ও ছাঁচ তৈরী করা, নোয়ালি ও উঁকার সাহায্যে ঢালাই মাল পরিষ্কার করা, কুঁদ টানার বা ঘোরানোর কাজ প্রভৃতি কাজ করেন। তবে ঢালাইয়ের কাজও এঁরা করেন। কালো নিকারী নামক এক ব্যক্তির শান্তিপুরে নিজস্ব ঢালাইয়ের কারখানা ছিল। পূর্বোক্ত ব্রজলাল বাবুর পৌত্র চৈতন্য দত্ত একজন বিখ্যাত ঢালাই মিস্ত্রী ছিলেন। কলকাতার নতুনবাজারে তাঁর নিয়মিত ঢালাই কাজ ছিল। সারা ভারতবর্ষের অজস্র বড় বড় মূর্তি তাঁর তৈরী। শান্তিপুরের বিখ্যাত পিতলের হরগৌরী মূর্তিটির নির্মাতাও তিনি। এস্থলে উল্লেখ্য যে, শান্তিপুরের অপর বিখ্যাত ঢালাই মূর্তি পিতলের দশভূজা দুর্গা মূর্তিটি কিন্তু শান্তিপুরে প্রস্তুত নয়, এটি উলা বা বীরনগরের মূর্তি। চোরে এটি শান্তিপুরে নিয়ে এসে এর স্বর্ণালংকারগুলি নিয়ে মূর্তিটি জলে ভাসিয়ে দেয়। পরে এটিকে উদ্ধার করা হয়। অপরপক্ষে শান্তিপুরের সকল বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের বড় ছোট রাধামূর্তিগুলি এখানেই বেশীর ভাগ ঢালা হয়।

# পিতলের রথ

অসম প্রতিযোগিতা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও মানুষের রুচির পরিবর্তন এবং সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থার রূপান্তর বাংলার যেসব শিল্প ও শিল্পীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে কাঁসা-পিতল শিল্প তার অন্যতম। স্টেনলেস ষ্টীল, এ্যালুমিনিয়াম, প্লাষ্টিক ইত্যাদির আবির্ভাব ও কাঁচামালের অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি এই শিল্পের সাধারণ মৃত্যুর কারণ হলেও এর সূক্ষ্মতর ও শিল্পসুষমামণ্ডিত শিল্পকলার মৃত্যু ঘটেছে বাংলার সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থার অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে। এই রকম এক শিল্পোৎকর্ষতার প্রতীক ছিল পিতলের রথ—যা আজ গল্পকথা ও মিউজিয়ামে ঠাঁই পেয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের জমিদার ও উঠ্‌তি ধনবানেরা তাঁদের বৈভব ও ধর্ম-বিশ্বাস প্রকাশ করতেন নতুন নতুন মন্দির ও দেবার্চনার নতুন নতুন আঙ্গিক নির্মাণের মাধ্যমে। রথও এরকম একটি আঙ্গিক। রথ বলতে আমরা সাধারণতঃ কাঠের রথ বুঝি। কোথাও বা সম্পূর্ণ কাঠের, কোথাও বা লোহার ফ্রেমের ওপর কারুকার্যময় কাঠ বসিয়ে এটি তৈরী হত। এছাড়া বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জায়গায় পাথর কেটে রথের আকার দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ রথ চলত না। কিন্তু এ ছাড়াও যে রথ সকলের মনোহরণ করেছিল তা হল পিতলের রথ। এটি শুধু চলত তাই নয়, প্রয়োজনমত এর সমস্ত টুকরো অংশ খুলে আলাদা করে ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া যেত এবং ব্যবহারের আগে ঘষে মেজে একে উজ্জ্বল করে আবার লাগানো হত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই শিল্প সকলকে চমৎকৃত করেছিল। এই রকম এক রথের শিল্পী ছিলেন নদীয়া জেলার রাধাবিনোদ দত্ত। তাঁর তৈরী রথ আজও কোচবিহার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে।

এ সময়ের কিছু অর্থ নৈতিক অবস্থার হিসাব এই রকম : চাল দেড়টাকা মণ, পিতলের সের চার আনা থেকে পুরানো পিতল সতের পয়সা ( অর্থাৎ বর্তমানের দশমিক মুদ্রায় ২৫ থেকে ২৭ পয়সা ) ), তৈরী পিতলের জিনিসের ( ফিনিশড্ গুড্‌স ) সের আট আনা থেকে দশ আনা। এর মধ্যে ঢালাই জিনিসের দাম কম—আট আনা সের। চাদর বা শীট-পিতলের তৈরী জিনিসের সের ছিল বারো থেকে চৌদ্দ আনা। এইরকম চাদরের তৈরী বিভিন্ন জিনিসকে বলা হত বাছা পিতল বা আচ্‌কা পিতলের জিনিস। সব মিলিয়ে পিতলের জিনিসের মণ ছিল ২২ টাকা থেকে ২৫ টাকা। এই সময়ে কাঁসা-পিতলের কারিগর বা মিস্ত্রীর মজুরীও ছিল বিভিন্ন। বড় অর্থাৎ 'সিনিয়র' ও দক্ষ কারিগর বারো আনা। অপর দিকে ছোট

মিস্ত্রী বা 'জুনিয়ার' ও অদক্ষ কারিগর ছ'আনা।

রথ তৈরীর কৃৎ কৌশল হিসাবে বলতে গেলে অন্যান্য লোহার রথের মতই রথের কাঠামো ( ষ্ট্রাকচার ) তৈরী করা আবশ্যক। এটি ঢালাই পিতলের করা দরকার। এই কাঠামোর ছাঁচ তৈরীর জন্য যে ফ্রেম বা মূল তা অন্য ঢালাইয়ের পিতলের চেয়ে শক্ত করা প্রয়োজন। তাই বাছা পিতলের সঙ্গে সীসা ও দস্তা মিলিয়ে তাকে শক্ত করা হত। সাধারণত ১ সের বাছা বা শুধ্ পিতলের সঙ্গে আধ-পোয়া সীসা ও দেড় ছটাক দস্তা মিশিয়ে এই 'এ্যালয়' তৈরী হত। এতে কাঠামো শক্ত ও মজবুত হত।

পিতলের রথ তৈরীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। চাকাগুলো হত লোহার। সাধারণতঃ সে সময়ে জলের পাম্পের কাজে ব্যবহৃত ( হ্যাণ্ড পাম্প ) বড় বড চাকাগুলো এই কাজে লাগানো হত। ধুরাও ( পিষ্টন ) লোহার মোটা রডের হত। তার ওপর রিপিট বা খিলেন-কব্জা করে পিতলের পাত লাগানো হত। কিন্তু চাকাতে সাধারণতঃ পিতল লাগান হত না। তারপর রথের মূল কাঠামো খাঁচাটি ( ষ্ট্রাকচার ) লাগানো হত। এটি শক্ত পিতলের ঢালাই কতকগুলো টুকরোকে একসঙ্গে ঝেলে বা রিপিট করে আঁটা হত। তার ওপর চাদর-পিতল দিয়ে মোড়ানো হত। এই চাদরগুলো কব্জা করে খাঁচার সঙ্গে আঁটা থাকত। লাগানোর আগে তার গায়ে বিভিন্ন দেবদেবী বা অন্য লীলাপ্রসঙ্গ ছেলাই ( খোদাই ) করে আঁকা হত। প্রয়োজনমত এই সব চাদরের টুকরোগুলো খুলে রেখে দেওয়া যেত। রথের আগে সেগুলোকে পরিষ্কার করে আবার লাগানো হত। এইভাবে রথ তৈরী হয়ে গেলে উপরের অংশ তৈরী হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রথের গায়ে এইসব মূর্তি বা ছবিগুলো সাধারণ অবস্থায় ছেলাই ( খোদাই ) হলেও অনেকক্ষেত্রে ঠোকাই অর্থাৎ পেছন থেকে ঘা দিয়ে তৈরী হত। মাঝে মাঝে রথের বৈচিত্র্য আনবার জন্য জায়গা বিশেষে তামার পাত লাগান হত। এইসব পিতল ও তামার চাদর বা শীট আসত জার্মানী থেকে। রথে তৈরী অংশ লাগাবার আগে 'ব্রাসো' জাতায় জিনিস ও তারপর কাপড়ের মধ্যে সুড়কি গুঁড়ো বেঁধে তাই দিয়ে মাজা হত। এসব কাজের আগে প্রথমে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষা হত। এই শিরিষ কাগজ তখন সুইডেন থেকে আসত।

রথের মাথার চূড়ায় নিশান, চক্র, গরুড় পক্ষী ইত্যাদি বসানো হত। নিশান-গুলো অবশ্যই তামার তৈরী হত যাতে দূর থেকে লাল নিশান রৌদ্রে ঝক্ ঝক্ করে। চক্র ও গরুড় ঢালা পিতলের হত। গরুড় ঢালাই করার আগে কাঠের গরুড় মূর্তি তৈরী করিয়ে নেওয়া হত। স্থানীয় সূত্রধর মিস্ত্রী এটি তৈরী করতেন। তার থেকে মাটির ছাঁচ করা হত। পরে এটি ঢালা হত। এদের নীচে গোঁজ অর্থাৎ লম্বা একটু চোকা অংশ থাকত ঐগুলি লাগাবার জন্য। ঢালাই কাজের

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মত। প্রথমে মাটির ছাঁচ তৈরী হয়। মাটি অত্যন্ত মিহি করে চেলে তারপর প্রয়োজনমত পাট ও তুষ মিশিয়ে নেওয়ার পর প্রতীক মূর্তির ওপর বসিয়ে এই ছাঁচ তৈরী হয়। অপর একটি মাটির পাত্র ( যার নাম মুচি ) তৈরী হয়। এর ভেতর প্রয়োজনমত পিতল ও অন্যান্য জিনিস অর্থাৎ রাং ইত্যাদি দিয়ে মুচি ও ছাঁচ একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ছাঁচের গায়ে একটি ফুটো বা গর্ত থাকে। পরে বড় উনুনের মধ্যে এটিকে বসিয়ে দিয়ে পিতল গলানো হয়। ঠিকমত গলে গেলে বড় সাঁড়াশির সাহায্যে সেই জ্বালের ( উনুনের ) মধ্য থেকে ঐটিকে তুলে উপুড় করে দেওয়া হয়। বড় মূর্তি হলে মাটির মধ্যে গর্ত করে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মুচি ও ছাঁচ ভেঙে মূর্তিটি বের করে ঘষা মাজা করে পূর্ণাবয়ব দান করা হয়। বড় মূর্তি হলে কয়েকটি টুকরো করে ঢালা হয়। পরে ঝালাই করে নিয়ে একটি পূর্ণরূপ দেওয়া হয়।

একটি রথ তৈরী করতে কতদিন ঠিক সময় লাগত তা বলা যায় না। কারণ নিজের অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা রথের কাজও করতেন। সাধারণতঃ বিশ্বকর্মা পূজার দিন ( ৩১শে ভাদ্র ) ঐ কাজ শুরু হয়ে রথের আগে সম্পন্ন হত।

একটি লক্ষণীয় জিনিস হল যাঁরা এইসব কাজে সহযোগী কারিগর ছিলেন তাঁরা সাধারণতঃ সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ হাড়ি, মালো, নিকারী প্রভৃতি জাতের লোক থাকতেন। 'জাতের ওঁচা কাঁসারী' এই জাতীয় প্রবাদবাক্যের অন্যতম কারণ হল সমাজের এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে কাঁসারীদের মেশামেশি। এঁরা মুচি তৈরী থেকে খোদাই, ছেলাই সব কাজই করতেন। ছেলাই ও খোদাইয়ের কাজ অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা করতেন। এঁদের হাতের অপূর্ব সুষমামণ্ডিত শিল্পকলা আজও জ্বলজ্বল করছে।

রথ নির্মাণে যে সব যন্ত্রপাতি দরকার হত তার কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণ কাঁসা পিতলের কাজে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় প্রধানতঃ সেগুলিই দরকার হত। তবে ফ্রেম বা খাঁচা নির্মাণের জন্য ঐসব যন্ত্রেরই অল্প পরিবর্তন করে নেওয়া হত। এই রকম কয়েকটি যন্ত্রের ও আনুষঙ্গিক জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হল যা সব কাঁসা পিতলের কাজে লাগে :

উঁকা—ঘষবার কাজে ব্যবহৃত গায়ে দাঁত তোলা লোহার লম্বা বস্তু। নানা রকম ও প্রকারের হয়। নামও বিভিন্ন। যথা,—'চুয়া' বা ঢালাইয়ের বাড়্তি অংশ ঘষে সমান করবার জন্য 'চুয়া' উঁকা, ফ্ল্যাট উকার নাম 'পাট' উঁকা, অর্ধগোলাকৃতির নাম 'মেকুন' উঁকা, গোলাকার উঁকা 'গোল' উঁকা, ইত্যাদি।

কলম—মূর্তির পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে চোখ কাটার ( খোদাইয়ের ) কাজে ব্যবহৃত ছেনী জাতীয় জিনিস।

পাটা—লম্বা কাঠ বা পাথরের ফালি। এতে নোয়ালি ঘষে ধার করা হয়।

কাতারী—পিতলের চাদর বা শীট কাটবার জন্য কাঁচি জাতীয় জিনিস।

আকন্দ কাঠ—কাঠের বা বাঁশের তৈরী বস্তু। এটিকে দু'পায়ের ফাঁকে রেখে হাত দিয়ে নোয়ালির সাহায্যে অপরিষ্কৃত জিনিস ঘষা হয়। দেখতে বড় আকারের তীরের ফলা বা বর্শার মত।

তাতাল—লোহার ত্রিভুজ আকারের মুখ বিশিষ্ট বস্তু। এটির সাহায্যে রাং বা অন্য দ্রব্য দিয়ে কোন জিনিসকে ঝালা হয়।

হ্যাণ্ড বাইস—ঘষবার সময়ে এই বাইসে আটকে দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করা হয়। সাধারণতঃ লোহার প্যাঁচ দেওয়া ছোটবড করবার সুবিধাযুক্ত এই যন্ত্র শক্ত করে কোন জিনিস আটকিয়ে রাখতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঠেরও হয়।

ভ্রমর বা তুরপণ—গর্ত করবার কাজে এবং পরী ইত্যাদির নাক, চোখ প্রভৃতি আঁকতে লাগে।

মুচি—পিতল গলাবার জন্য মাটির তৈরী পাত্র।

হাপর—ছোট উনুন জাতীয় জিনিস। সাধারণতঃ তাতাল গরম করা হয়। জ্বালানী হিসাবে কাঠকয়লা ব্যবহৃত হয়।

মোট—হাপরে হাওয়া দেওয়ার জন্য চামড়ার তৈরী বাঁশের হাতল দেওয়া বস্তু।

আউট বা ভ্রাগ—ছাঁচ ঢালার পিতল গলাবার জন্য খুব বড় আকারের কয়লার উনুন।

ধুনার আঠা—ছিদ্র বন্ধ করার কাজে ধুনার সাহায্যে প্রস্তুত শক্ত আঠা জাতীয় জিনিস।

কাঠথাল—চাদর বা শীট পিতলের সরায় ঘা দেওয়ার জন্য গর্তসমেত কাঠের মুগুর।

কুঁদ—লম্বা কাঠের মুগুর বা ধুনুরীর তুলা ধোনার কাজে ব্যবহৃত হুঁকা জাতীয় জিনিসের মত দেখতে। এর একদিকে খুব মোটা করে 'গালা' লাগিয়ে দিয়ে তার গায়ে চেঁচে পরিষ্কার করার বস্তুটি গরম করে আটকে দেওয়া হয়। হাত কুঁদের ক্ষেত্রে একজন লোক সামনে বসে ঐ কুঁদের গায়ে জড়ানো দড়িটিকে একহাতে টানে ও অপর হাতে ছাড়ে। এইভাবে ঘোরানো হয়। বড় কুঁদের পেছনের দিকে একটি হাতল দেওয়া বড় চাকা থাকে। তার সঙ্গে বাঁধা দড়ি বেল্টের মত কুঁদের সঙ্গে লাগানো থাকে। চাকাটিকে একটি লোক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুঁদটিকে ঘোরায়। আবার ছোট মোটরের সাহায্যেও কুঁদ ঘোরানো হয়। কুঁদের অপর প্রান্তে একব্যক্তি নোয়ালি চেপে ধরে কুঁদের গায়ে লাগানো বস্তুটিকে পরিষ্কার করে দেয় ও বিভিন্ন আকারের বাহারী

দাগও কেটে দেয়।

কুঁদের গালা—গালার সাহায্যে কুঁদের গায়ে কোন বস্তুকে আটকে তাকে নোয়ালির সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়। নামে 'গালা' হলেও এটি লাক্ষা দ্বারা প্রস্তুত গালা নয়। এটি তৈরী করে নিতে হয়। ১০০ গ্রাম ধুনোর সঙ্গে ১০ গ্রাম সরষের তেল এবং অল্প পরিষ্কার শুকনো মাটি ভাল করে চেলে নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে এটি তৈরী হয়।

নোয়ালি—চেঁচে পরিষ্কার করবার কাজে ব্যবহৃত লোহার তৈরী চওড়া মুখ যুক্ত বস্তু। প্রয়োজনমত লম্বা বা ছোট হাতল জুড়ে নেওয়া হয়। হাতে ঘষার কাজে ব্যবহৃত। বিভিন্ন রকম কাজের জন্য বিভিন্ন রকম আকারের। নামও বিভিন্ন। যথা,—টোকন, দিরু, টিপ, তিলে ইত্যাদি।

গজ বা শাবল—লোহার মোটা লম্বা দণ্ড বিশেষ। ঘড়া, ঘটি, কমণ্ডলু ইত্যাদি চাদর পিতলের কাজে লাগে। এর ওপর পিটিয়ে কোন জিনিসের গায়ের টোল ( ঘা লেগে বসে যাওয়া গর্ত ) তোলা হয়। বিভিন্ন রকমের হয়: খুরা তৈরীর জন্য 'নকী', সোজা মাথার 'মাটা' ইত্যাদি।

ছেনী—খোদাই কাজের জন্য ব্যবহৃত। বিভিন্ন প্রকারের: যথা, মুড়কি, চিনচিনে, বড় মুখ ইত্যাদি। নাম খোদাইয়ের জন্য 'বুলি' ছেনী ব্যবহার করা হয়।

বলা বা টাব—গর্তের মধ্যে প্যাঁচ কাটার কাজে ব্যবহৃত। বলা ধরা হয় 'হাতল' দিয়ে।

হাতুড়ি—ঘা মারবার কাজে ব্যবহৃত। নানা ওজনের ও নানা রকমের হয়। সোজা করবার জন্য 'উল্লা', পিটিয়ে বড় করবার জন্য '১নং বড় মোকা', কানা তৈরীর জন্য 'কানা সাড়া', ছোট কাজের জন্য 'মাটনা' এবং ডলনা, বগা ইত্যাদি।

নেয়াই—বড় লোহার খণ্ড। এর ওপর পিতল রেখে ঘা দেওয়া হয়। কোন কোনটির ওপরের অংশ বাড়ানো থাকে। বর্ধিত অংশের নাম 'কানি'। কোনটির ওপরে গর্ত থাকে পিতলের চাদর খাল করার জন্য। এর নাম 'খাল নেয়াই'।

পান—সাধারণতঃ জোড়া দেওয়া বা ঝালার জন্য ব্যবহৃত। পান দু রকমের—১) পিতল পান ও ২) খুঁট পান। পিতল পানে থাকে ১ কেজি পিতল, ৩০০ গ্রাম দস্তা ও ১০ গ্রাম রাং। ঝালবার সময়ে অল্প সোহাগা দিতে হয়। বেশী সোহাগা দিলে পান ধরবে না—ছিট্‌কে যাবে! খুট পান নরম,

অল্প উত্তাপে গলবে। 'ভরণ' জাতীয় জিনিস ঝালতে এই পান ব্যবহার হয়। এ-ছাড়া সাধারণ 'রাং ঝাল' হয়। এক্ষেত্রে রাং ও সীসা অর্ধেক হারে মিশিয়ে ঝালা হয়। ঝালার জায়গাটি 'মিউরিটিক এ্যাসিড, দিয়ে ঘষে নিতে হয়।

রসপান—ফুটা বন্ধ করবার কাজে ব্যবহৃত। এটি তৈরী হয় রজন ১ কেজি, ২০০ গ্রাম মোম ও ভূষা কালি মিশিয়ে। অনেকে সঙ্গে পিচ বা গালা দেয়।

নালুক—এটি মূর্তি ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত কোন যন্ত্র বা ব্যবস্থা নয়। তবে কাঁসা পিতলের ব্যবসায় সদা ব্যবহৃত পদ্ধতি। পুরানো আস্ত থালা, বাটি, গ্লাস, ঘড়া ইত্যাদিকে কুঁদে ও চেঁচে পরিষ্কার করে নতুনের মত তৈরী করা হয়। এর নাম নালুক। সাধারণতঃ নালুকের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই সমস্ত পরিষ্কার করা জিনিসের তলায় বা নীচের দিকে ঘন কালো রং করা থাকে। এই কালো কোন রং দিয়ে করা হয় না। তুঁতে ও গন্ধক আধাআধিভাবে দিয়ে তার সঙ্গে নিশাদল অল্প মিশিয়ে এইরকম রং করা হয়।

# শান্তিপুরের এক বিস্মৃত ব্যবসায়ী

শান্তিপুর যেমন তার শিল্পদ্রব্যের জন্য সারা ভারতে বিখ্যাত তেমনি এখানকার ব্যবসায়ীরাও দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপুরের বাইরে তাঁদের ব্যবসার জন্য সুপরিচিত। এইরকম একজন ব্যবসায়ী হলেন শ্রীকালী সরকার। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি আসামে নুনের ব্যবসা করতেন। 'সন ১২০৯ বাঙ্গলা—৯ জৈষ্ঠী সন ১৮০২ ইংরেজি ২২ মাই' (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে) তারিখে 'মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীযুত মেরকুইষ উইলেষলি নবাব গবনর জানরেল ইন কৌনসেল সাহেব বরাবরেষু' লিখিত তাঁর একটি চিঠিতে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ চিঠিতে তাঁর ঠিকানা দেওয়া আছে 'সাকিনে সিমলা (এবং 'সিমিলের মাত্রিপেতা') পরগণে শান্তিপুর জেলা নদিয়া'। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির আর কোন বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়না।

শ্রীসরকার আসামের গোয়ালপাড়ার জনৈক শ্রীযুক্ত বরনের্ড মেকালম সাহেবের (মিঃ বার্নার্ড ম্যাকলাম) নুনের এজেন্টে হিসাবে কাজ করতেন। তার পরিবর্তে তিনি যে সমস্ত জিনিস নিয়ে আসতেন তা খুবই আকর্ষণীয়। প্রধান আমদানী দ্রব্য ছিল মুগাধুতি, মুগাসুতা হাতির দাঁত এবং কড়ি। সে সময়ে আসাম থেকে এই ধরণের জিনিসই আমদানী করা হত এবং এদের চাহিদাও ভাল ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশের কাছে সাহেবদের লেখা চিঠিতে দেখা যায় যে নগদ টাকার চেয়ে আসামে নুন ও আফিমের বদলে রসদ সংগ্রহ করাই বেশী সুবিধা।

একবার কালী সরকার সময়মত ম্যাকলাম সাহেবের প্রাপ্য অর্থ শোধ করতে পারেন নি। অনুমান হয় আসাম থেকে বদল করা জিনিসগুলি সময়মত বিক্রি না হওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে। সেজন্য শ্রীসরকারকে সাহেবের পক্ষ থেকে একজন জামিনদার দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি জনৈক কমল নারায়ণ বড়ুয়াকে তাঁর হয়ে জামিনদার নিয়োগ করেন।

বাংলা ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত গোয়ালপাড়া দিয়ে আসামে মালপত্র যাতায়াত করত। গোয়ালপাড়ার অপরপারে ব্রহ্মপুত্রের ধারে হদিরা গ্রামে ছিল কাণ্ডারচৌকী বা শুল্ক আদায়-চৌকী। এখানে আসামের রাজার পক্ষ থেকে দুজন বড়ুয়া মহাজনদের কাছ থেকে আমদানী ও রপ্তানীকরা জিনিসের জন্য মাশুল আদায় করতেন। যদিও সরকারী নিয়ম ছিল যে শতকরা ১০ টাকা হারে মাশুল নেওয়া হবে কিন্তু তাঁরা তাঁদের খুশিমত অর্থ আদায় করতেন। এঁরা খুবই প্রভাবশালী ছিলেন এবং এঁদের বিনা অনুমতিতে কাণ্ডারচৌকী পার করে কোন কিছুই নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এঁদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন আবেদনই

রাজদরবারে গ্রাহ্য হত না। এই বড়ুয়ারা ছিলেন কিন্তু কাণ্ডারচৌকীর ইজারাদার—সাধারণ রাজ কর্মচারী নয়। ডাঃ বুকানন হ্যামিলটন তাঁর আসামের বিবরণে এই দুজন ইজারাদারকে পরশুরাম ও কমল নামে দুই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন। এই কমলকেই কালী সরকার জামিন রেখেছিলেন।

জামিনদার পাওয়ার পর কালী সরকার পুনরায় নুন নিয়ে আসামে যান। এবার অন্যবারের তুলনায় একটু তাড়াতাড়ি বদলী মাল নিয়ে তিনি এবং ম্যাকলাম সাহেবের লোকেরা কাণ্ডারচোকীতে এসে কমল বড়ুয়াকে খবর পাঠান যাতে তিনি এসে তাদের সঙ্গে হিসাব পত্র করান। নৌকা মালসমেত ঘাটেই বাঁধা থাকে। ম্যাকলাম সাহেবের লোকেরা পরের দিন সকালে মালের হিসাব করবে এই রকম ঠিক হয়। রাত্রি প্রায় দুটোর সময়ে জুগীঘোপার মিঃ রবার্ট ব্রাইডির পক্ষে উইলিয়াম টাকার লোকজন নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এবং তরোয়াল উঁচিয়ে জোর করে ঐ নৌকা জুগীঘোপায় নিয়ে যায়। কালী সরকার বারবার অনুরোধ করলেও তারা শোনেনা। বরং কালী সরকারকে বেঁধে রেখে দিয়ে ঐ নৌকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে জুগীঘোপায় সব মাল খালাস করে নেয় এবং টাকা পয়সাও সব কিছু নিয়ে নেয়। ব্রাইডি বা টাকার কারোর কাছেই কালী সরকারের কোনরকম টাকা পয়সা ধার ছিলনা। কালী সরকারের জামিনদার কমলনারায়ণ টাকারের বিরুদ্ধে রংপুরের আদালতে মামলা করেন। কিন্তু আদালত কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি গভর্ণর জেনারেলের শরণাপন্ন হন। ঐ চিঠিতে কালী সরকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরও বলেন যে, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক আসামে যেমন ব্যবসা করত তেমনি নিজেদের সিপাহি রেখে অন্যদের ওপর অত্যাচার চালাত। তাদের সিপাহিরা সৈন্যদের মত পোষাক পরত এবং প্রতিটি ব্যবসায়ীর কুঠির নিজস্ব নিশান থাকত। প্রকৃতপক্ষে ঐসব সিপাহিরা যখন পাওনা আদায়ের জন্য বা নিছক জবরদস্তিমূলক অভিযান চালাত তখন তাদের নিশান ও পোষাক দেখে সাধারণের ধারণা হত যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরাই বুঝি নিজেরাই সরকারী উদ্যোগে পাওনা আদায় করছে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বণিক জিন ব্যাপটিষ্ট সিভালিয়ার গোয়ালপাড়ায় কুঠি স্থাপন করেছিলেন। শিবরাম শর্মা বৈরাগী নামে জনৈক অসমিয়া ব্যাপারীর কাছে তাঁর একলক্ষ টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু শিবরাম নানা অছিলায় ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করে। হ্যামিলটন তাঁর বিবরণীতে জানিয়েছেন যে অসমিয়া ব্যবসায়ীরা অনেক সময়েই বাঙালী ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের টাকা আপোষে মিটিয়ে দিতেন না। সিভালিয়ার ১৭৭৮ সালে পাভাল, বোলি ও লিয়ার নামে তিনজন সিপাহিকে দিয়ে শিবরামের ছেলে রুদ্ররামকে আটক করেন।

প্রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের প্রাক্তন সৈন্য ড্যানিয়েল রৌশ ১৭৬৮

সালে গোয়ালপাড়ার কাওয়ারচৌকীর বড়ুয়াদের সাহায্যে আসাম-বাংলার আমদানী রপ্তানী ব্যবসা একচেটিয়া করে ফেলার পরই বড়ুয়াদের ইজারা প্রথা এবং আসামের সঙ্গে বাংলার ব্যবসায়ীদের অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার বিরোধিতা শুরু করেন। ১৭৭০ সালে ড্যানিয়েল রৌশ, টমাস কটন এবং রবার্ট ব্রাইডি আসামে বাণিজ্যের পরোয়ানা পান।

রৌশ সাহেবও ফৌজ রাখতেন। আর সেই সৈন্য নিয়ে আসামে অত্যাচার করতেন। রৌশের অংশীদার রবার্ট ব্রাইডি রংপুরে নীলের ব্যবসা করতেন। নীলকরদের স্বভাবমত ব্রাইডিও জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালাতেন। কালী সরকারের চিঠিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওয়েলস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিশকে লিখেছিলেন যে, আসামে নুন ও আফিমের বদলে নগদ অর্থের পরিবর্তে মালপত্র সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। কালী সরকারের চিঠিতেও আমরা দেখি যে, তিনি নুনের বদলে মুগার কাপড়, সুতা, হাতির দাঁত প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। আবার সে সময়কারের আদালতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আবেদন করে যে কোন ফল পাওয়া যেতনা তার প্রমাণও আমরা ঐ চিঠিতে পাই।

আসাম তার নুনের জন্য বাংলার ওপর একান্ত নির্ভরশীল থাকত তাও ঐ চিঠি থেকে বোঝা যায়। আসামের সদিয়া এলাকায় অল্প পরিমাণ নুন তৈরী হত। বাঁশের চোঙার মধ্যে করে ঐ নুন জোড়হাটে আসত। কিন্তু তা' নিতান্তই অল্প। দামও ছিল খুব বেশী। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁর 'মিড্‌নাপুর সল্ট পেপার্স' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, বাংলা থেকে পাঠানো নুনের ওপর আসাম নির্ভরশীল ছিল। ব্রিটিশ, ফরাসী, দেশীয় ও ডাচ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালাতেন। ১৭৮০ সালে ডেভিড কিলিকানকে আসামে নুন পাঠানোর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। এর দু'বছর পর কোম্পানী নিজেই এই অধিকার নিয়ে নেয়। তাদের হিসাব ছিল যে, কোম্পানী বছরে আড়াই লক্ষ মণ নুন আসামে পাঠাবে। অবশ্য বাস্তবে তারা মাত্র পঁচাশি হাজার মণ নুন পাঠাতে পেরেছিল। গভর্ণর জেনারেলের কাছে ওয়েলসের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে, আসামে বছরে একলক্ষ কুড়ি হাজার মণ নুন সরবরাহ করা হত। বুকানন হ্যামিলটনও তাই বলেছেন। এর থেকে একটি তথ্য পাওয়া যায়। পরিসংখ্যানবিদদের হিসাব অনুযায়ী একজন ব্যক্তি বছরে ৭ পাউণ্ড বা প্রায় তিন কেজি নুন ব্যবহার করে। সেই হিসাব অনুসারে ঐ সময়ে সমগ্র আসামে অর্থাৎ বর্তমানের মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, মিজোরাম সহ আসামের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র পৌনে চব্বিশ লক্ষের মত।

কালী সরকারের চিঠির মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের পাথুরে প্রমাণ

পাওয়া যায়। কিন্তু চিঠিটির সর্বাধিক গুরুত্ব হল তার ভাষা। চিঠিটি যখন কালী সরকার লেখেন তখন বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের গঠন কার্য চলছে। এই সময়কার ভাষার নমুনা খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলনে' পুরানো বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে এই চিঠিটিকে অতি গুরুত্ব সহকারে উদ্ধার করেছেন। তাই সমস্তদিক বিচারে শান্তিপুরের এই ব্যবসায়ী কালী সরকারের, ব্যবসায়ী হিসাবে যত না গুরুত্ব, ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে গুরুত্ব আরো বেশী।

সবশেষে তাঁর চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে :

" ৺৭শ্রীরামঃ

মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীযুত মেরকুইষ উইলেষলি নবাব গবনর জানরেল ইন কৌনসেল সাহেব বরাবরেষু—

শ্রী কালি সরকার সাং—সিমিলের মাত্রিপেতা—

দরখাস্ত শ্রী কালি সরকার সাকিনে সিমলা পরগনে শান্তিপুর জেলা নদিয়া গরিব পরওর সেলামত আমার আরজ এই মোকাম গোয়ালপাড়ার শ্রীযুত মেঃ বরনের্ড মেকালম সাহেবের কুঠিতে আমি লবনের পাইকারি করি লবন কর্জ্জ লইয়া আসামে বিক্রি করিয়া জিনিষ বদলাই ও নগদ জে আমদানি করি তাহা মেকালম সাহেবের কুঠিতে দেই আমার মেয়াদ খিলাফ হওাতে সাহেব আমার ঠাই জামিন তলব করিলেন আমি আপন খুসিতে শ্রীযুত কমলনারায়ণ বড়ুয়াকে জামিন দিয়া মেকালম সাহেবের কুঠীর লবণ লইয়া আসাম গিয়াছিলাম আসামে লবণ বিক্রি করিয়া বদলাই জিনিষ মুগাধুতি মুগাযুতা হাতির দাঁত কড়ি এই সকল লইয়া আসমের চৌকি কাণ্ডারে বোঝাই নৌকা সমেত পোঁছিলাম ১৫ আশ্বিন চারিদণ্ড বেলা থাকিতে আসাম সরহদ্দে নৌকা রাখিয়া আমি এবং মেঃ মেকালম সাহেবের তরফ লোক জামিনদার বড়ুয়াকে খবর দিলাম বড়ুয়া সাহেবের লোককে কহিলেন তোমরা কল্য প্রাতে জিনিষ ওজন লইবা সাহেবের লোক বোঝাই নৌকার নিকট রহিল সেই রাত্রে দুই প্রহরের সময় মোঃ জুগিঘোপার মেঃ রাবট ব্রেডি সাহেবের তরফ মেঃ উলেম টকর সাহেব এক পাঁনসি নৌকা সমেত কারতিওালা সিপাই মত্র সঙ্গিন তোসদান পাথরকলা বন্দুক এবং সাহেব মজকুর নিজে বন্দুক কিরিচ কেরাবিন লইয়া আসাম তালুকের সরহদ্দে আসিয়া জবরদস্তি নৌকার রসি কাটিয়া সিপাই আমার বোঝাই নৌকার পর উঠাইয়া দিয়া আসাম সরহর্দ্ধ হইতে নৌকা খুলিয়া কোম্পানির সরহদ্দে জুগিঘোপাতে আনিলেক মেঃ মেকলম সাহেবের লোকে কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দিলেক এবং বড়ুয়ার লোকে ৺সর্গদেব মহারাজার দোহাই দিলেক তাহা যুনিলেক না তাহাদিগে গুলি মারিলেক এবং কিরিচ খুলিয়া কাটিতে গেলো বন্দুক ফএর করাতে সকল লোক ভয়প্রযুক্ত পলাইল আমি নৌকাতে

ছিলাম টকর সাহেবকে কহিলাম জে জবরদস্তি কেন কর আমি বড়ুয়াকে খবর দেই তাহাতে সাহেব মজকুর কিরিচ লইয়া আমাকে কাটিতে উঠিলেক এবং আমার নৌকাতে সিপাই নেখাবান দিয়া টকর সাহেব আপন ঘরে গেলেন পর দিবষ প্রাতককালে আপন লোক দিয়া জিনিষ ও নগদ আপন গোলাতে উঠাইয়া নিলেন আমি মেঃ মেকালম সাহেবের দেনা সেওায় ব্রাডি সাহেব কিম্বা টকর সাহেবের দেনা রাখিনা তাহার সহিত কোন কারবার নাই এ বিসয় আমার জাবিনদার বড়ুয়াকে মেঃ মেকালম সাহেবের ঘরে জাবিন দিয়া দাইক করিআছি এ কারণ জাবিনদার বড়ুয়া জেলা রঙ্গপুরের জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করি আছেন তাহাতে কিছু হইল না জজ সাহেব ইংরেজ লোকের পর নালিষ করাতে কম মনজোগ করেন কোট আপিলেতে সাহেব লোকের পর নালিষ করাতে এবং জে ২ সাহেব কোম্পানির কাজ রাখেন তাহাদের খাতির রাখিয়া নালিষ লওাতে তাচ্ছ্ল্য করেন আমি গরিব কোন উপায় নাই টকর সাহেবের সহিত এ মকর্দ্দমা সুপরেম কোটে করি এমত জোত্র নাই সাহেব মালিক মেঃ টকর সাহেবকে ইহার তলব দিয়া আমি গরিবের পর নেকনজর ফরমাইয়া হক ইনসাফ করিতে হুকুম হয় ইহা আরজ মিতি—সন ১২০৯ বাঙ্গলা—৯ জৈষ্ঠী সন ১৮০২ ইংরেজি ২২ মাই—”

# পঞ্চাশের মন্বন্তর ও শান্তিপুর

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল। লোকে আর খাইতে পাইল না। অখাদ্য খাইয়া না খাইয়া...দেহত্যাগ করিতে লাগিল।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র বর্ণনা এইভাবেই দিয়েছেন। তারপর দু'শ বছরের বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আমাদের বাংলাকে গ্রাস করেছিল। বাংলার মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ অনাহারে ও অখাদ্য আহারে মারা যায়। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত এই মহা-দুর্ভিক্ষ আজও বাঙালীর স্মৃতিতে রয়েছে। ১৩৫০ সালের এই দুর্ভিক্ষের পঞ্চাশ বছরের স্মরণে কলকাতায় এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে সেই দুর্ভিক্ষের সময়কার বিভিন্ন ছবি, ফটো, সংবাদ, লিফলেট্ প্রভৃতি দেখানো হয়। এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জনসাধারণের প্রচেষ্টার খবরও সেখানে প্রদর্শিত হয়। জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ প্রমুখের আঁকা দুর্ভিক্ষের বেশ কিছু ছবিও ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর লেখা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বইয়ে এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও বিশালতার বর্ণনা আছে। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান হিসাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিদেশ থেকে জাহাজ ভর্তি চাল পাঠাবার প্রস্তাব করলে ব্রিটিশ সরকার তা' প্রত্যাখ্যান করে। অথচ অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।

এই শোচনীয় দুর্ভিক্ষ শান্তিপুরকেও গ্রাস করেছিল। শান্তিপুরবাসী কিভাবে সেই দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করে তা আজ আমরা অনেকেই জানিনে। একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আকাল অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে শান্তিপুরবাসী দৃঢ়তার সঙ্গে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করেছিল।

এই সংকট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ১৩৫০ সালের ১৯শে শ্রাবণ 'শান্তিপুর কো-অর্ডিনেটিং রিলিফ কমিটি' গঠন করেন। ভিক্টোরিয়া রোডে (বর্তমানের নেতাজী সুভাষ রোড) এঁদের অফিস স্থাপিত হয়। এই কমিটির গঠন ছিল নিম্নরূপ :—সভাপতি—পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম, এল, এ.; সহঃ সভাপতি—শ্রী জগদীশ চন্দ্র মৈত্র, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট; সম্পাদক—ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পি, এইচ, ডি, ডি, লিট; বিভাগীয় সহঃ সম্পাদকগণ—অফিস বিভাগ: শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়; ক্রয় বিভাগ: শ্রীপ্রমথনাথ বঙ্গ; বণ্টন বিভাগ: পণ্ডিত অজিত কুমার স্মৃতিরত্ন; কোষাধ্যক্ষ: ডাঃ বিশ্বরঞ্জন রায়, এম, বি; সহঃ কোষাধ্যক্ষ: শ্রীকমল কৃষ্ণ সান্যাল, বি, এল, সি; হিসাব পরীক্ষক: অতুলচন্দ্র বসু; পাবলিসিটি অফিসার: ডাঃ সুধীর চন্দ্র মৈত্র, এম, বি;

সভ্যবৃন্দ : মৌলভী মহম্মদ আফজালুল হক, চেয়ারম্যান, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি ; সর্বশ্রী ডাঃ নলিনী মোহন সান্যাল, পি, এইচ, ডি ; মৌলভী হাজী মহম্মদ আব্দুল খালেক, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ; পাঁচু গোপাল চট্টোপাধ্যায়, রিটায়ার্ড পোষ্টাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ; গোবিন্দ গোস্বামী ; নীরদ রঞ্জন গুহ, রিটায়ার্ড সেসন জজ ; অমিয় কুমার সান্যাল ; ডাঃ অশ্বিনী কুমার রায়, এম, বি ; ডাঃ পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক, এম, বি ; মৌঃ আবদুস সাত্তার ; বিনয় কৃষ্ণ দে ; পাঁচুগোপাল সেন ; হরকালী দাস ; প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ; মৌঃ মহম্মদ আবদুল ওয়াহাব, এম, এস, সি ; চণ্ডীচরণ দে। এই দীর্ঘ কমিটির গঠন থেকে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে শান্তিপুরে সেবা কাজ যথাযথভাবে পরিচালনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই ধরণের দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটি পূর্বে বা পরে আর কোনদিন শান্তিপুরে হয়নি।

তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সাহায্য সংগ্রহ করতে থাকেন। সেই সময়ে শান্তিপুর ন্যাশনাল ক্লাবের একটি কনসার্ট পার্টি ছিল। এই কনসার্ট পার্টি নিয়ে দলে দলে ছেলেরা বিভিন্ন পাড়ায় সাহায্য ও দান সংগ্রহ করত। এই উপলক্ষে একটি গানও বাঁধা হয় যেটি কনসার্ট পার্টির সঙ্গে গাওয়া হত :

কে কোথায় আছ এসো গো দয়াল, এসেছি তোমারই দ্বারে।
ব্যাকুল ব্যথিত অভাব পীড়িত মরিতেছে অনাহারে॥
কাড়িয়া লয়েছে ভীষণ যুদ্ধ ধান্য, অর্থ আজি।
তাদের জন্য তোমারই দুয়ারে এসেছি ভিখারী সাজি॥
যার যা ইচ্ছা, যার যা শক্তি, দাও গো সকলে আনি।
ক্ষুধিতে দাও মা মুষ্টি ভিক্ষা,—অন্নপূর্ণা রাণী॥

বুকের বসন নাই গো মায়ের, ভগিনী রয়েছে রুগ্ন।
দুধ বিনা যায় শিশুর পরাণ, কণ্ঠ তাহার শুকনো॥
পাতা খেয়ে আছে কিশোর কিশোরী, মরণ দাঁড়ায়ে শিরে।
কাঁপিছে শরীর, কাঁদিছে বধির, অন্ধ রয়েছে ঘিরে॥
যার যা ইচ্ছা, যার যা শক্তি, দাও গো সকলে আনি।
ক্ষুধিতে দাও মা মুষ্টি ভিক্ষা,—অন্নপূর্ণা রাণী॥

দেশের শকতি, জাতির শকতি, সমাজের ভিত ওরা।
উহারা ধরম, উহারা করম—মরে নর দেবতারা॥
এতদিন তারা খাটিয়া খাটিয়া অন্ন দিয়াছে সবে।
এরা যদি মরে, মরণ সবার—রহিবে কে তবে ভবে ?

যার যা ইচ্ছা, যার যা শক্তি, দাও গো সকলে আনি।
ক্ষুধিতে দাও মা মুষ্টি ভিক্ষা,—অন্নপূর্ণা রাণী ॥

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের বিষবাষ্প শান্তিপুরের ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকেও স্পর্শ করে। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫০ সালে তাঁর লিখিত 'দুর্দিন' কবিতায় দেশবাসীর দৈন্য দশাকে তিনি তুলে ধরেছেন এইভাবে :

"ভিখারী কাঁদিয়া ফিরে, দে-মা দুটি অন্ন ; / তিনদিন খাই নাই, জল ছাড়া অন্য। / গৃহস্থ কহিছে তারে, আজ আট বেলা ; / মুখে কিছু পরে নাই, নিভাইতে জ্বালা। / যার ছিল গোলাভরা, মাঠে পাকা ধান / সেই আজ খাদ্যাভাবে ত্যজিছে পরাণ।"

শান্তিপুরের জনসাধারণ অকৃপণভাবে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই সময়ে সমগ্র বাংলার জন্য যে রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সহঃ সভাপতি জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী শান্তিপুর কমিটির সম্পাদকের কাছে এক হাজার টাকা দান করেন এবং অন্যান্য সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কমিটি বাজার থেকে ধান কিনে সস্তায় বিক্রি করতে থাকেন। সেই সঙ্গে চাল ও কাপড় স্বল্পমূল্যে বিক্রয় এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করেন। তখন যুদ্ধের কারণে ও সরকারী আদেশে বাইরে থেকে ধান, চাল কেনায় নিষেধ থাকলেও শান্তিপুরের জন্য এই বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়। কমিটি শান্তিপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে একটি লঙ্গরখানা খোলেন। সেখানে রোজ প্রায় এক হাজার লোককে দীর্ঘ দেড়মাস ধরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। এজন্য তাঁরা আড়াই হাজার টাকার ওপর নগদ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন।

১৩৫০ সালের ২০ শে কার্তিক এই কমিটির পক্ষ থেকে 'শান্তিপুর সন্তান ও প্রবাসী বন্ধুগণের' কাছে একটি 'আবেদন' প্রচার করা হয়। আবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁরা বলেন, "...এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে যখন সারা বাংলায় অন্নপূর্ণা অন্নহীন হওয়ায় দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল শান্তিপুরবাসী অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়াও 'ম্যায় ভুখা হুঁ' একথা বলিতে পারিল না। তখনও অন্যূন ২৫০০ টাকা নগদ ও খাদ্যদ্রব্য দিয়া স্থানীয় লঙ্গরখানায় দেড়মাস কাল প্রত্যহ সহস্রাধিক মুমূর্ষু অনশন ক্লিষ্টদের অন্ন যোগাইল। কিন্তু আজ তাহারা নিরুপায়, মুষ্টিভিক্ষা দিবারও ক্ষমতা নাই। বহু পরিবার অর্দ্ধাশনে, বহু অনশনে, বহু শিশু মৃত্যুশয্যায়। ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অখাদ্য ভোজনে রোগক্লিষ্ট, অনশনে অনেকে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। শহরে কলেরায় ৮০ জন মরণের শরণ লইয়াছে। জাতির আশাকল্পতরু বালগোপাল শিশুগণ দুগ্ধাভাবে কঙ্কালসার, শহরে ৮৫ জন শিশুর জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। জাতির মেরুদণ্ড মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্নাভাবে

স্বাস্থ্যহীন, তিলে তিলে মরণ পথযাত্রী। তাহাদের লঙ্গরখানায় যাইবার সামর্থ্য নাই, মুষ্টিভিক্ষা করিবারও সামর্থ্য নাই, বাহির হইবার বস্ত্র নাই। মহাত্মন, এত দুঃখের মধ্যেও ঐশী করুণায় আমরা শেষ প্রচেষ্টা ছাড়ি নাই। গঠনমূলক কার্য্যের সহায়ক সকল শ্রেণীর ও সকল মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আপন আপন কর্ত্তব্য পালনের ভার লইয়া "শান্তিপুর কো-অর্ডিনেটিং রিলিফ কমিটি" গঠন করিয়াছেন। ...শান্তিপুর সন্তান ও প্রবাসী বন্ধুগণ, এদেশের আয়ু ও বায়ু, অন্ন ও জল, সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ব্যবস্থা আপনাদের গড়িয়া তুলিয়াছে সেইকথা স্মরণ করাইয়া দিবার আজ সময় আসিয়াছে। আপনাদের নিকট অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি ও ঔষধাদি আজ ভিক্ষা করিতেছি। দেশের এই সঙ্কটকালে জাতির দাবী ও দেশবাসীর ভিক্ষাপাত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম।" কমিটির এই মর্মস্পর্শী আবেদন নতুন করে শান্তিপুরবাসীর মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে। সকলে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। শান্তিপুরবাসীদের সাহায্যে ও উদ্যোগে অনাহার জনিত মৃত্যু বাংলার অন্য অংশের মত তীব্রভাবে এখানে দেখা দেয়নি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এইভাবে নিরন্ন শান্তিপুরবাসীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার দায় শান্তিপুরের কিছু ব্যক্তি ও তাঁদের নেতৃত্বে সমগ্র শান্তিপুরবাসী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

# দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ ও শান্তিপুরের ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ হল। গান্ধীজি বার বার করে বলেছিলেন যে, দেশ ভাগ করে যদি স্বাধীনতা আসে তবে তা' আসবে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে। কিন্তু তাঁর জীবিত অবস্থায় দেশ বিভাগ হল এবং তিনি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, কেনই বা দেশ ভাগ হল এবং কারাই বা এর জন্য দায়ী। কারণ দেশ বলতে ভারতবর্ষ ভাগ হলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিন্ধু সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুতরাং দেশ বিভাগের আঁচ সেখানে খুব কমই লেগেছিল। কিন্তু বাংলা এবং পাঞ্জাব—এই দুটি প্রদেশকে ভেঙে টুকরো করা হয়।

ভারতের মুসলিম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নার দাবী ছিল তাঁর প্রস্তাবিত পাকিস্তানে সমগ্র বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অপর দিকে এখানকার নেতৃবৃন্দের একাংশের দাবী ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করতে হবে। আবার এই দুই দাবীর মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের দাবীও ওঠে। ফলে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম প্রশ্ন জাগে। বিশিষ্ট নেতা চক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারী বললেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে না। এই রকম এক রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে দেশ বিভাগ সম্পন্ন হল। সর্বত্র পনেরই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হলেও শান্তিপুরের জনগণ জানতেন না শান্তিপুর ভারত না পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যাবে। অবশেষে সতেরই আগষ্ট ঘোষিত হল যে শান্তিপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে শান্তিপুরের রাজনৈতিক জগতও ছিল মেঘসংকুল। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। লীগ প্রধানত পরিচালিত হত অবাঙালী মুসলমানদের দ্বারা। তাদের অর্থে এবং প্রত্যক্ষ মদতে শান্তিপুরেও মুসলিম লীগ তাদের হিন্দু বিদ্বেষী কার্যকলাপ চালাত। এদের হাত থেকে প্রতিবাদকারী সাধারণ বাঙালী মুসলমানরাও রেহাই পেত না। সেইসঙ্গে বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক দিক থেকে এইসব গুণ্ডাদের সাহায্য করতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হতে থাকে। নদীয়ায় এই সময়ে একজন এইরকম ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। এছাড়া সর্বত্র বাংলার বাইরে থেকে আনা সশস্ত্র পাঠান সৈন্য পাঠানো হতে থাকে। এ সবের যোগসাজসে অবস্থা এমন পর্যায়ে যায় যে, মুসলিম লীগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোথাও কণামাত্র প্রতিরোধ এলেই মুসলিম লীগের সঙ্গে একত্রে প্রশাসন ঐ প্রতিরোধকারীর বিরুদ্ধে

এগিয়ে যেত। ফলে অমুসলমানদের পক্ষে বাংলার জীবন, সম্মান বা সম্পত্তি রক্ষার পথ খোলা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে বাংলাকে ভাগ করে আলাদা স্বাধীন প্রদেশ দাবী করা হয় এবং এটি যাতে ভারতীয় ডোমিনিয়নে থাকে তার জন্যও আন্দোলন শুরু হয়। আজকাল অনেকে মনে করেন হয়ত' উদ্যোগ নিলে ঐ সময়ে দেশ বিভাগ ঠেকানো যেত। কিন্তু সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকালে বোঝা যাবে ঐ ধারণা অমূলক।

এই সময়ে দেশের সার্বিক আবহাওয়ায় একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ এবং তারই ফলস্বরূপ নৌ-বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার বোঝে যে, এদেশে তাদের আর বেশীদিন থাকা সম্ভব হবে না। তাই তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের কয়েকটি ঘোষণায়ও একথা স্পষ্ট করে বলা হয় যে, তাঁরা যতদ্রুত সম্ভব চলে যেতে ইচ্ছুক। তাই বাংলার তৎকালীন নেতৃবৃন্দও বাংলার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। একদিকে জিন্নার প্রস্তাবমত প্রস্তাবিত পাকিস্তানে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী। অন্যদিকে একটি প্রস্তাব ওঠে বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হোক। শেষোক্ত দাবীটি ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠেছিল। দাঙ্গা এবং মুসলিম লীগের শত অত্যাচার সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলার সমর্থক অনেকেই ছিলেন। যদিও তাঁরা এ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে সমস্তরকম ক্ষমতার অধিকারী হবে। কিন্তু শান্তিপুর তথা নদীয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেটের জঘন্য সাম্প্রদায়িক আচরণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটায়। প্রশাসন সাধারণভাবে নিরপেক্ষ থাকবে—এইরকম চিন্তায় তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা এটুকু ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যাই করুন নিরপেক্ষ প্রশাসনের ফলে সকলে নিরাপদ থাকবেন। তাই প্রশাসনের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁদের নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে। শান্তিপুরের সন্তান পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার এগারো জন গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাছে ১৯৪৭ সালের ২রা এপ্রিল এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে এটি একটি অসামান্য মূল্যবান তথ্য। তাঁরা তাঁদের স্মারকলিপিতে বললেন, যে আমরা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিম্নস্বাক্ষরকারী সদস্যগণ, প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বঙ্গপ্রদেশ গঠন সম্পর্কে এই বিবৃতি দেওয়া আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

গত দশ বৎসরে দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা গভীর মনোনিবেশ

সহকারে অনুধাবন করেছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমান সদস্যদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে তাঁরা এদেশের সমগ্র প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক করে তুলেছেন। ফলে সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করানো হচ্ছে। তাছাড়া মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও বেপরোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রদেশের প্রশাসনকে প্রায় অচল ও ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছেন।

গত আগষ্ট মাস থেকে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ সহ যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে আমাদের সব কিছু নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সরকারের সহায়তায় কিংবা তাদের মৌনসম্মতিতে মুসলিম লীগের সমর্থকদের দ্বারা আগুন লাগানো, খুন, লুট, ধর্ষণ, অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করা, ধর্মস্থান অপবিত্রকরণ ও সম্পত্তি ধ্বংস প্রভৃতি যে সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনা কলকাতা ও তার আশেপাশে ঘটছে তার ফলে আমরা এই অবস্থার বাস্তব মূল্যায়ন করছি। হিন্দু ও বাংলার অন্যান্য জাতির জীবন, সম্ভ্রম, স্বাধীনতা, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার, তা ঠিক করার সময় আমাদের এসেছে।

আমরা আরও এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছি কারণ ব্রিটিশ সরকার গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০ শে জুনের মধ্যে তাঁরা ব্রিটিশ ভারতের জন্য কোনরকম একটা 'কেন্দ্রীয়' সরকারকে অথবা কোন কোন বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা ভারতের জনসাধারণের জন্য যে রকম ব্যবস্থা সকলের চেয়ে ভাল বলে মনে করবেন তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে চলে যাবেন। মুসলিম লীগ ঘোষণা করেছে যে, স্বাধীন বাংলাসহ সার্বভৌম পাকিস্তান তাদের দাবী। এর থেকে কিছু কম তারা নেবেনা। সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে, এরকম হলে বাংলার হিন্দু ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে চিরকালের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত হবে।

তাই আমরা মনে করি ভারতীয় ডোমিনিয়নের মধ্যে এক স্বাধীন বাংলাপ্রদেশ আমরা চাই। এ ব্যাপারে আমরা বাংলার ও ভারতের জনগণের মতামত যাচাই করেছি। আমরা নিশ্চিত যে, বেশীর ভাগ লোকই এটি চায়।

আমরা আরও আশংকিত এইজন্য যে, মুসলিম লীগ নিজেরা 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' বলে এক বে-সরকারী সৈন্যদল গঠন করছে। এরা এই প্রদেশের শান্তি ও স্থিতি নষ্ট করতে উদ্যত। ইতিপূর্বেই তারা এই প্রদেশের বাইরের অবাঙালী মুসলমানদের দিয়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। সেই সঙ্গে একমাত্র

মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য প্রশাসনিক অফিসার নিয়োগ করছে। ফলে সংখ্যা-লঘুদের আত্মরক্ষার ক্ষুদ্রতম চেষ্টাকেও অত্যাচারের দ্বারা শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।

তাই সব দিক বিচার করে আমরা আপনার কাছে বলতে চাই যে, অবিলম্বে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে এক স্বাধীন প্রদেশ গঠন করা হোক্। সেটি ভারতীয় ইউনিয়নে থাকবে। আর এই বিষয়ের প্রস্তুতি হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন ও পরিবর্তনকালীন ব্যবস্থাদি তদারকির জন্য অবিলম্বে বর্তমান বাংলা প্রদেশের দুটি অংশের জন্য আলাদা আলাদা ম্যাজিষ্ট্রেট সহ একই গভর্নরের অধীনে দুটি আঞ্চলিক প্রশাসন গঠন করা হোক্।

এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে প্রথমেই ছিলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র স্বয়ং। অন্যান্যরা হলেন সর্বশ্রী সুশীল কুমার রায়চৌধুরী, সুরপৎ সিং, সত্যেন্দ্র কুমার দাস, জে, ঘোষাল, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রলাল খান, ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী, ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, আনন্দমোহন পোদ্দার এবং দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

এঁদের এই সম্মিলিত স্মারকলিপি বাংলার তৎকালীন অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রি-সভার অব্যবহিত পূর্বে জাতীয়তাবাদী ফজলুল হকের কৃষক প্রজা মজদুর দলের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল সেটি যদি টিকে যেত তাহলে হয়ত' বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে বইত। যখন এই মন্ত্রিসভার সংকট উপস্থিত হয় তখন তাঁরা বার বার করে বিভিন্ন দলের সাহায্য চেয়েছিলেন। এবং একথাও তাঁরা বলেছিলেন যে, ঐ জাতীয়তাবাদী সরকারের পতন হলে কঠোর সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ দেশের শাসনকর্তায় পরিণত হবে। সেই দিন বাংলার চরম সর্বনাশ সাধিত হবে। কেউ এগিয়ে আসেননি। বরং কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বাংলার কংগ্রেস দলকে ফজলুল হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভার পতন ত্বরান্বিত করবারই নির্দেশ দেয়। ফলে বাংলাকে চরম সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের অধিকারে দিয়ে দেওয়া হল। যদি কংগ্রেস হাইকমাণ্ড এই ভুলটি না করতেন তাহলে দেশের ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হত। তাই মুসলিম লীগের বিভীষিকাময় অত্যাচারের পর বঙ্গভঙ্গ অপরিহার্য ছিল। শান্তিপুরের জননায়কের এই উদ্যোগ ইতিহাসের একটি পদচিহ্নস্বরূপ।

# শান্তিপুরে গাজির বিয়ে

প্রতি বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে শান্তিপুরের মালঞ্চ নামক এলাকার বিরাট মাঠে এক বিচিত্র লোক উৎসব হয়। এটি 'গাজি মিঞার বিয়ে' নামে পরিচিত। সাধারণ লোকের কাছে এটি 'গাজির বিয়ে' বলেই বিখ্যাত। এই উৎসবটি মুসলমানদের উৎসব। কিন্তু হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এতে যোগ দেয়।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে এটির এমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। দুটি বিরাট বাঁশকে মাঠের মধ্যে পুঁতে রাখা হয়। বাঁশ দুটি পাশাপাশি থাকলেও দুটির মধ্যে প্রায় একহাত পরিমাণ জায়গা থাকে। বাঁশ দুটির গায়ে বিচিত্র বর্ণের কাপড়ের খোল পরানো থাকে আপাদমস্তক। একে বলা হয় 'জামা'। এই বাঁশ দুটিকে ঘিরেই বসে বিরাট মেলা। এ দুটি হল মামা ও ভাগ্নের প্রতীক। শুধু শান্তিপুর থেকেই নয়—শান্তিপুরের ওপারে কালনা এমনকি সুদূর বর্ধমান থেকেও যাত্রীরা আসেন এই মেলায়। আসে বিচিত্র দোকান পসারী। আর আসে দূর দূরান্ত থেকে বাউল ফকিরের দল। বৈশাখ মাসের শেষ রবিবার রাত্রে উৎসব শুরু হয়ে সারা রাত্রি চলবে। তারপরের দিন অর্থাৎ সোমবারের বিকালে বিচিত্র আচার পদ্ধতির মধ্যে শেষ হবে মেলার প্রধান উৎসব। সোমবারের বিকালে বিভিন্ন এলাকার লোকেরা বাজনা, আলো, বাজি, পটকা নিয়ে শোভাযাত্রা করে মেলা প্রাঙ্গণে আসে। নাচ-গান চলে অবিরত। উৎসবের আনন্দে সকলে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। যত সন্ধ্যা হতে থাকে ততই উৎসব মেতে ওঠে। সন্ধ্যার পরই লোকজনের ধাক্কা ধাক্কিতে দুটি বাঁশ পরস্পরের সঙ্গে ঠেকে যাবে। অমনি ঘোষণা করা হয় 'মামা' ও 'ভাগ্নের' পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আবার আগামীবছর এই দিনে বিয়ের আয়োজন হবে। অবশ্য দোকান পসারী থাকে তারও পরে কিছু দিন। আর এই মেলায় দেখবার মত হল কাঁদি শুদ্ধ তালের বাজার। দলে দলে লোক তাল নিয়ে বসে আছে। চাহিদামত তাল কেটে তালশাঁস বের করে দিচ্ছে। অনেকে আস্ত তালও কিনে নিয়ে চলেছে বাড়িতে। কিন্তু কে এই গাজি মিঞা যাঁকে ঘিরে এই উৎসব তার হদিশ কেউই ঠিকমত জানেন না। এমন কি প্রকৃতই গাজি মিঞার কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা তাও জানা যায় না।

একজন স্থানীয় লেখকের মতে 'শান্তিপুর সুতরাগড়ের মালঞ্চ নামক স্থানে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে গাজি মিঞার বিবাহ নামক একটি উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসব বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায় 'গাজী মিঞা'

আজমীর প্রদেশের একজন সাধু মুসলমান। হিন্দুদের সহিত যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি বিবাহ দিবসে প্রাণ বিসর্জন করেন। সুতরাং তাঁর বিবাহের আয়োজন হয়েছিল মাত্র, বিবাহ প্রকৃত পক্ষে হয়নি। আজও সাধুর স্মৃতির জন্য বিবাহের নানাপ্রকার আয়োজন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই মহম্মদীয় উৎসব উপলক্ষে অনেক হিন্দু কুল মহিলারাও মানসাপূর্বক উপবাস করে থাকেন এবং গাজি মিঞার উদ্দেশ্যে সিন্নি প্রভৃতি প্রদান করে জল গ্রহণ করেন'। (কার্ত্তিক চরিত— বিশ্বেশ্বর দাস, পৃ, ২৫)। অপরদিকে নদীয়া স্মারক গ্রন্থ, রজতজয়ন্তী সংখ্যায় লিখছেন: 'শান্তিপুরের মালঞ্চ পল্লীতে গাজি মিঞার বিবাহ নামে একটি উৎসব হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে উৎসবের দিন রঙ্গীন কাপড়ে মোড়া চারটি বাঁশ পুঁতে মুসলমানরা নানারূপ বাজনা বাজিয়ে, সারারাত উৎসব করেন। পরের দিন দুপুরে গ্রামের একজন বৃদ্ধা মুসলমান রমনী জহুরা বিবি সেজে পাল্কী করে ঐখানে আসেন, বাঁশগুলি প্রদক্ষিণ করে চলে গেলে উৎসব শেষ হয়।'

এই উভয় মতের সংমিশ্রণে আলহজ্জ ডঃ মহাম্মদ আমির আলি (ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'শান্তিপুর ও মুসলমান সমাজ') আর একটি মজার কথা বলেছেন। দিল্লীর এক সুলতানের মেয়ের প্রেমে পড়ে এক দরবেশ। নবাব তা জানতে পেরে তাকে দিল্লী থেকে তাড়িয়ে দেন। অনেক দিন পরে ঐ দরবেশ রুক্ষ চুল উদাস ভাবে আবার দিল্লীতে আসেন এবং পায়জামা পরিহিত অবস্থায় একটি লাঠির মাথার ওপর সাদা চামর পরিয়ে নবাব বাড়ীর সামনে আপন মনে প্রেয়সীর নাম বিড়বিড় করে বলতে থাকেন। আর নবাব নন্দিনীও বিয়ে করেন নি। দরবেশের নাম স্মরণ করতে করতে কুমারী অবস্থায় মারা যান। তারই বিরহ স্মরণে এই অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অনেকেই মনে করেন পূর্বে বৃদ্ধ-দরবেশ সেজে অনেক প্রণয়ী বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রেয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত।

অপর মতে গাজি সাহেব ওরফে মাদার সাহেব বর্তমান উত্তর প্রদেশের মোকারামপুরের অধিবাসী। এই দরবেশকে সাধারণতঃ সকলে 'গাজি' বলে ডাকতেন। তিনি জহুরা নামে এক মেয়েকে ভালবেসে ছিলেন। কিন্তু বিয়ের আগেই জহুরা বিবির মৃত্যু হয়। দরবেশও আর বিয়ে করেন নি। মৃত্যুর পর তাঁকে জহুরার পাশেই কবর দেওয়া হয়। তাঁর শিষ্যরা স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ কয়েকটি নিশান পুঁতে দেন। কালক্রমে এই নিশানগুলিকেই লোকে মাদার সাহেবের নকল বিয়ের প্রতীক হিসাবে পুনরাবৃত্তি করে থাকেন।

তাই প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ রবিবার বাঁশের নকল গাজি সাহেব তৈরী করে মালঞ্চের মাঠে খাড়া করা হয়। পরের দিন সোমবার বিয়ের আসর বসে। পাত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন সূত্রাগড়ের কারিকর পাড়ার লোকেরা। আর পাত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেন খোন্দকার পাড়ার লোকেরা। পূর্বে চন্দনকাঠকে কাপড় জড়িয়ে

গাজির প্রণয়িনী জহুরা বিবি বলে উপস্থিত করানো হত। সেই সময়ে গাজির ভাগিনা অর্থাৎ অপর একটি বাঁশ গাজিকে ছুঁয়ে দেয়। ফলে বিয়ে আর হয় না। বিয়ে ভেঙে যায়। পরের বছর আবার এই একই অভিনয়।

সৈয়দ দীনমোহাম্মদ সুফী ( ১৬২০-১৭২২ ) আওরংজেবের কাছ থেকে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট সম্পত্তি পীরোত্তর বা মদতমাস ( ধর্মার্থে দেয় ) হিসাবে পান। এই সব সম্পত্তি দেওয়া হয় এখানে ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আবার ১৭০৭-এ শাহ্ আলমের কাছ থেকে আরও সম্পত্তি পান। পরে ১৭২৯-এ তাঁর ছেলেকে সম্রাট মহাম্মদ শাহ আরও ৩শ বিঘা সম্পত্তি দেন। এঁর সময়েই শান্তিপুরে অস্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তিনি কঠোর ভাবে মুসলিম ধর্ম পালন করতেন। অপরদিকে তাঁরই উদ্যোগে শরীয়ত বিরোধী গাজি মিঞার বিয়ে আরম্ভ হয়। তিনি বর্ধমান থেকে মুসলমানদের এনে এখানে তাঁর জমিদারিতে বাস করাতে থাকেন—যাতে মুসলমান জনসংখ্যা এখানে বৃদ্ধি করা যায়।

মালঞ্চ নাম থেকে মনে হয় আগে ফুলবাগান ছিল। তবে এই সময়ে ( ১৭-১৮ শতাব্দী ) মোগল আসে দলে দলে। তার থেকে এখানে মির্জানগরীও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

অনেক জায়গায়ই এই অনুষ্ঠান হয়। ভারতের অন্যত্রের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুরের কাছে হরিপুরের হরনদীতেও এই অনুষ্ঠান হয়। অনেকের মতে যখন থেকে কবর পূজা, দর্গা শরীফ পূজা, পীর পূজা প্রভৃতি শুরু হয় তখন থেকেই এটি আরম্ভ হয়।

শাহ দেওয়ান ( ১৪৮০-১৫৭১ ) নামক এক ব্যক্তির পূর্বপুরুষ নাকি তৈমুরের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। আবার অপর মতে বোগদাদ থেকে দশজন ধর্মপ্রচারক গৌড়ে এসেছিলেন। আটজন রাজধানীতে থেকে যান। একজন যান পূর্ববঙ্গে। অপরজনের কোন খবর পাওয়া যায় না। ইনিই নাকি এই শাহ দেওয়ান অর্থাৎ তাপস শ্রেষ্ঠ। এঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সৈয়দ মহিউদ্দীন ( ১৫৩৫-১৬২৮ ) মালিক হন। ইনি দিল্লীতে জন্মান। বাবার সঙ্গে শান্তিপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচারে আসেন। এই সময়ে চৈতন্যদেবের শিষ্যরা বাবলা থেকে শান্তিপুরে আসেন। তাঁর ছেলে সৈয়দ দীন মোহাম্মদ সুফী ( ১৬২০-১৭২২ ) মালিক হন। তাঁর সময়ে এই গাজির বিয়ে প্রচলিত হয়। তাঁর ছেলে সৈয়দমালেক ( ১৬৭২-১৭২৫ )। এঁর পরে সৈয়দ দরবেশ ( ১৭০০-১৭৬৮ ) এবং তাঁর পরে সৈয়দ ওয়াজেদ আলি ( ১৭৩৪-১৮৪৮ ) ওরফে পঞ্চু খোন্দকার বা পঞ্চু মিয়া এই জমিদারীর মালিক হন। প্রথম জীবনে চাকরী করতেন। পরে সাধু হন। গান গাইতেন—ওলো সখি জলে ঢেউ দিওনা—আমি কালা চাঁদের মুখ দেখেছি। ওয়াজেদ আলির মেয়ে আপন

নেছা বিবি ( ১৭৭১-১৮৪০ )। তাঁর ছেলে সৈয়দ মাজেম হোসেন।

আবার অনেকে মনে করেন এটি বীরভূম অঞ্চলের ইঁদপূজার মুসলমানী সংস্করণ মাত্র। ইঁদপূজার ক্ষেত্রেও বিরাট মাঠের মধ্যে ৪০।৫০ হাত লম্বা দুটি শালগাছ এনে পোঁতা হয়। এদের গায়েও নতুন কাপড় পরানো হয়। একটির মাথায় ডালপালা রাখা হয়। তার ওপরও কাপড় দেওয়া হয়। একটি হল ইঁদ। অন্যটি হল মাসী। একেবারে লোক উৎসব। অবশ্য বর্তমানে একে ব্রাহ্মণ্য রূপ দিয়ে 'ইন্দ্রধ্বজ' বলা হয়। এখানের উপকথা হল যে, অসুর ও ইন্দ্রের মধ্যে লড়াইতে পরাজিত ইন্দ্রকে বিষ্ণু এই ধ্বজ দান করেন অথবা এই ধ্বজের সাহায্যে ইন্দ্র অসুরদের পরাজিত করেন। এখানেও সারারাত্রি ব্যাপী গানবাজনা হয়।

পূজার পদ্ধতির মধ্যেও আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়। ইঁদের পায়ের কাছে অর্থাৎ গোড়ায় ফলমূল ও ফুল দেওয়া হয়। গাজির ক্ষেত্রেও তাই। তবে কাটা ফল অল্পই থাকে। তার পরিবর্তে খিলি করে পান বা কলার পাতাতে পানের সরঞ্জাম গাজির গোড়ায় পূজা দেওয়া হয়। মেয়েরা অত্যন্ত ভক্তিভরে এইসব পূজার উপকরণ উপহার দেন। তবে ইঁদ হয় ভাদ্র আশ্বিন মাসে; আর এটি হয় বৈশাখ মাসে।

সোমবারের সকালে অনেক মেয়ে তাঁদের সন্তানদের মঙ্গলকামনায় গাজির কাছে মানত করেন। গাজির মুরশিদ তাঁর সন্তানের গায়ে চামড় বুলিয়ে দেন। গাজির পায়ের কাছে দেওয়া ফুল ইত্যাদি সন্তানের মাথায় ঠেকিয়ে দেন। মা ঐ ফুলের অংশ নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকান ও সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। অনেকেই এই ফুল হাতে মাদুলি করে বেঁধে দেন। প্রণামী বাবদ যে পয়সা তা' ঐ মুরশিদের প্রাপ্য। শুধু মুসলমানই নয়-অনেক হিন্দু মহিলাও মানত করেন। বর্তমানে এই বড় দুটি ছাড়াও অনেকগুলি গাজির বাঁশ অন্য অন্য দলে বসায়। তবে সেগুলি আকারে ছোট এবং সেখানে উপস্থিত ভক্তের সংখ্যাও সীমিত। বড় গাজির দুটি বাঁশের নতুন সিল্কের জামা করে দিয়েছেন ঐ এলাকার ধনাঢ্য এক হিন্দু। সম্পূর্ণ ঐ বিশাল বাঁশ দুটির ওপর লাল ও সবুজ সিল্কের পা পর্যন্ত 'জামা'। ধারে রূপালী জরির কাজ।

প্রকৃতপক্ষে শান্তিপুরের এই লৌকিক উৎসব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক প্রতীক হিসাবেই গণ্য।

## 'শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিনভাগে'

রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, শান্তিপুর ভাগীরথী বা গঙ্গানদী থেকে অনেকদূরে অবস্থিত। স্টেইনশাম মাষ্টার নামক জনৈক ব্যক্তির ১৬৭৬ ও ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট-ডিসেম্বর মাসের ভাগীরথী ভ্রমণের দিনলিপি পরবর্তীকালে মানচিত্রসহ প্রকাশিত হয়। তাতেও দেখা যায় যে, শান্তিপুর ভাগীরথী থেকে অনেক দূর। আবার 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' ( ১৭৭৫ খ্রীঃ ? ) তে আছে যে, গঙ্গার তীরে শান্তিপুরের অবস্থান। এসব থেকে বোঝা যায় যে শান্তিপুরে অনেকবার নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে এবং গঙ্গা বা ভাগীরথীর শাখা প্রশাখাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে শান্তিপুরের বুকে বিভিন্ন ভাবে খাত স্থষ্টি করে নতুন নতুন প্রবাহ স্থষ্টি করেছে। শান্তিপুরকে ঘিরে যে অজস্র খাল, বিল, হাওড় ইত্যাদি রয়েছে তাতেই এটি বোঝা যায়।

অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিনভাগে'। অর্থাৎ গঙ্গানদী ও তার শাখাপ্রশাখাগুলি শান্তিপুরের নানাদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। গঙ্গার একটি শাখা বর্তমানে অদ্বৈত পাট হিসাবে বিখ্যাত বাবলা নামক স্থানের দক্ষিণ ভাগে কিছুদূর যাওয়ার পর দক্ষিণমুখী হয়ে বানক ও নির্ঝরের ( নেজর ) মধ্য দিয়ে সাড়াগড হয়ে বক্তার ঘাটে মূল গঙ্গার সঙ্গে মেশে। মূলগঙ্গা বলতে গঙ্গার যে প্রধান শাখা নবদ্বীপ থেকে কালনা ও গুপ্তিপাড়ার খাল দিয়ে শান্তিপুরের দক্ষিণ ভাগে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বয়রা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরপথে ফুলিয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল তাকে বোঝায়।

বাবলা ও নির্ঝরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের মূল ছিল কিন্তু গঙ্গা নদীই। নবদ্বীপ থেকে যে প্রাচীন গঙ্গা শান্তিপুরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ছিল তার একটি শাখা স্বরূপগঞ্জের দক্ষিণে পৌছায়। এখানেই নদীয়ার মহারাজা বসবাসের জন্য 'গঙ্গাবাস' ও 'আনন্দবাস' গ্রাম স্থাপন করেন। ঐ শাখাটি আনন্দবাসের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাওসাডাঙ্গা, সগুনা ও ভোলাডাঙ্গার পশ্চিমদিক দিয়ে এসে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি ভাগ পশ্চিমে বাগাঁচড়ার বাগ্‌দেবী তলা দিয়ে পুরানো মূল গঙ্গায় মিলিত হয়। এটি বাগ্‌দেবীর খাল নামে পরিচিত। এর দুপাশে শিঙেডাঙ্গা, ভালুকা, গোয়ালাপাড়া, কুলিয়া ( কুলে ), করমচাপুর প্রভৃতি বর্তমান।

অপর ভাগটি বাঁকাপথে বাগ্‌দেবীর খাল থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে দিগ্‌নগরের পশ্চিমদিক দিয়ে গোবিন্দপুর ও ডিঙ্গিপোতা গ্রামের পাশ দিয়ে এসে সেনেরডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়না। 'গঙ্গাবাস'

থেকে আসা শাখাটি 'সগুনার বিল' আর দিগ্‌নগরের দিকে যাওয়া শাখাটি 'গোপিয়ার বিল' নামে খ্যাত।

অপরদিকে বাগাঁচড়া ও ব্রহ্মশাসনের মধ্যদিয়ে একটি ধারা কুলোই চণ্ডীতলা দিয়ে রঘুনাথপুরের উত্তর দিয়ে কুতুবপুরের দক্ষিণে এসে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। মনে হয় পশ্চিমদিকে রঘুনাথপুরের কাছে রঘুমণ্ডলের দীঘিতে এসে মেশে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, গোপিয়ার বিল থেকে কুলে গ্রামের পাশ দিয়ে একটি শাখা রঘুনাথপুরের কাছে এসে দুভাগে বিভক্ত হয়। এ খাত বিলুপ্ত। তবে বিশেষভাবে লক্ষ করলে পূর্বের মত অনুযায়ী তিনটি খাতের চিহ্ন দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার এই ধারাটি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে দিক পরিবর্তন করেছে। একটি শাখাকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পাঁচপোতার সর্দারপাড়ার মধ্য দিয়ে কোচের বিল হয়ে আবার পূর্বদিকে এসে রেলের পুলের তলা দিয়ে বড়বিলে এসে পড়তে দেখা যায়। বর্তমানে মূল শাখার সঙ্গে যোগাযোগহীন। কোচোর বিলের এক মাইল মত জায়গায় সারাবছর জল থাকে। বড়বিল এখন জলাভূমিতে পরিণত। মনে হয় এই শাখাটি বাবলা থেকে উলা বা বীরনগরের খিস্‌মা হয়ে বৈঁচি গ্রামের কাছে বাঁকাভাবে ঘুরে ফুলিয়ার কাছে গঙ্গায় মেশে। আবার কখনও বীরনগর থেকে খিস্‌মা হয়ে চূর্নী নদীতে, কখনও উলা বা বীরনগর থেকে বাঁকাভাবে বৈঁচি হয়ে রাঘবপুরের ( হবিবপুর ) পাশ দিয়ে তারাপুরের কাছে গঙ্গায় মিশেছিল। তারাপুরের আমদাবিল তারই চিহ্ন। তাছাড়া উলা বা বীরনগর থেকে ফুলিয়ার পাশ দিয়ে যে শাখাটি প্রবাহিত ছিল তা বৈঁচি হয়ে নবলা ও ঘোড়ালিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে এসে সাবেক গঙ্গায় মিলিত হয়। নবলার কাছে পূর্বে একে 'তেমোহানী' বলত। এই শাখাটি একসময়ে বীরনগরের বর্তমান বিলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুতুবপুর থেকে তৃতীয় শাখাটি দক্ষিণ-পূর্ব মুখে এগিয়ে মেলের মাঠের মধ্য দিয়ে এসে নতুন হাটের পশ্চিম বরাবর পুলিশফাঁড়ির গর্ত হয়ে সেখের পুকুর, লংকাপুকুর, পালের দীঘি, সরিবৎ উল্লার পুকুর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দহের পূর্বদিকে এসে খাত সৃষ্টি করে পূর্বতন ট্র্যাঙ্ক রোডের নীচে গঙ্গার একটি শাখায় পরে। মেলের মাঠ থেকে এই শাখাটি বিলুপ্ত। নদীপথের বিভিন্ন সময়ের পথপরিবর্তনজনিত খাতগুলি এখনও বর্তমান এবং বিভিন্ন জায়গায় ঐগুলি খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এইসব নদীপথ একসময়ে খুবই গভীর ও জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত ছিল। শান্তিপুরের এলাকার মধ্যেই হরিনদী নামক বন্দরের উল্লেখ অনেক পুরানো বইপত্রে পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম থেকে গৌড় যাওয়ার পথে নৌকাগুলি হরিনদীতে আশ্রয় নিত। চৈতন্যভাগবতেও এই হরিনদীর উল্লেখ আছে। অবশ্য মূল হরিনদীর অধিবাসীরা বর্তমানের হরিপুর, বেলেডাঙ্গা, সাহেবডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবর প্রদত্ত এক ছাড়পত্রে শান্তিপুরের চতুঃসীমার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে নির্ঝর, পূর্বে সুরুগড় (বর্তমানের সাড়াগড়), পশ্চিমে গোপিয়া।' ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাকটরির এজেন্ট ও গভর্নর উইলিয়াম হেজেস তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন : "আমরা শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় এক বিশাল বটগাছের ছায়ায় আমাদের নৌকাগুলি বাঁধলাম ও খাওয়াদাওয়া করলাম।" এইসব শান্তিপুরের নদীগুলির নাব্যতার প্রমাণ দেয়।

বর্তমানের সি. আর. দাস (ট্র্যাণ্ড) রোডের নীচে দিয়ে যে খাল নামক জলপথের খাত বর্তমান তা অদ্বৈতাচার্যের সময়ে খুবই বেগবতী ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কুতুবপুর থেকে যে তিনটি শাখা ছিল তা সবই বেরয় ভাগীরথীর এই 'খাল'টির উৎপত্তিস্থল বেলেডাঙার হরিনদীর কাছে শিমুলতলার ছাড়িগঙ্গা থেকে। ছাড়িগঙ্গা নাম থেকে বোঝা যায় যে, এটি একদিন মূল নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে এর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। যাই হোক্ এই শাখাটি ঐ জায়গা থেকে বেরিয়ে বর্তমান হরিপুরের বিল থেকে ডাইনপাড়ার দক্ষিণে শাঁখাড়ির বিলের মধ্য দিয়ে কালনা রোডের পাশ দিয়ে মতিগঞ্জ হয়ে বক্তারঘাটের কাছে গঙ্গায় মিশেছিল। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত ঐ খালে বর্ষার সময়ে জল আসত। এটিকে বাওরের খালও বলা হয়। লোকে এখানে বাইচ্ খেলত এবং মেয়েরা চাপড়া ষষ্ঠীর ব্রত ঐ খালের জলেই সম্পন্ন করতেন। কিন্তু এখন শুকনো। মধ্যে মধ্যে চাষ করা হচ্ছে।

তিলডাঙা তারাপুরের কাছে নীলনগর মৌজা থেকে একটি খাত উত্তর গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে আমদার বিলে পড়েছে এবং অন্যদিকে আমদার বিলের মধ্যদিয়ে একটি শাখা বেড়িয়ে নয়নবেড়িয়ার খাল নামে ভাগীরথীতে মিশেছিল।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের এক জায়গায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ফুলিয়ার 'দক্ষিণ পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী'। বর্তমানে ফুলিয়ার যে স্থানটি কৃত্তিবাসের জন্মভিটা নামে চিহ্নিত তার দক্ষিণ পূর্বে একটি খাত দেখা যায়। এটিকে 'রামসাগর' বলা হয়। সেই সময়ে 'গঙ্গা তরঙ্গিনী' বোধহয় ঐ রামসাগরের ওপর দিয়ে কৃত্তিবাসের ভিটার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হত। তাছাড়া রামসাগর নামটি থেকে মনে হয় পরবর্তীকালে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐখানে একটি বদ্ধ জলাশয় গঠিত হয়। কৃত্তিবাস যেহেতু ঐখানে বসেই তাঁর রামায়ণ লিখেছিলেন তাই জনপ্রবাদে ঐটি 'রামসাগর' নামে খ্যাত হয়।

এইভাবে নদী বারবার তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। পলাশীর যুদ্ধের সময়ে গঙ্গা বা ভাগীরথী ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি। এখন তা প্রায় সোজাভাবে বইছে। ফলে অনেক জায়গায়ই বিল বা দহের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির কোনটিতে বর্ষায়

জল আসে কোনটি বা একেবারেই শুকনো। শান্তিপুরেও এরকম প্রচুর বিল বা দহ আছে।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন ছাড়াও নদীর পাড় ভাঙ্গা ও সেইসঙ্গে বন্যা শান্তিপুরের নদীপথের একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া ছিল বলা যায়। 'সম্বাদ তিমির-নাশক' পত্রিকার ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৮ / ৩০শে ভাদ্র, ১২৩৫ তারিখের একটি সংবাদে দেখা যায়: "সংপ্রতি কোন মান্য লোকের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মোকাম শান্তিপুরের গঙ্গার পাড় যাহা প্রতি বৎসর ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা এবৎসরও পুনরায় বর্ত্তমান মাসের প্রথমে ভাঙ্গিয়া থানা ঘরাদি একেবারে কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ১৩ ভাদ্র তারিখের বৈকালে (মতি) গঞ্জ অবধি হাট খোলার বাজার পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পাড় ভাঙ্গিয়া লোকেরদের বাগান ও বাটী এবং বৃহৎ ২ বৃক্ষ প্রভৃতি যাহা অনেক কালের ছিল তাহা জলে ভাসিয়া এককালে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ নাই এক্ষণে ঐ সকল স্থান কেবল জলময় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকার যদ্যপি রাত্রিকালে আরো ভগ্ন হয় তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থল হইবেক।"

# পাকিস্তানী শান্তিপুর

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষকে দু'ভাগে ভাগ করে স্বাধীনতা এল। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হল। এরই সঙ্গে পূর্বতন বঙ্গদেশকে ভেঙে দু' টুকরো করা হয়। আবার তারই অঙ্গস্বরূপ নদীয়া জেলাকে কেটে দু'ভাগ করা হয়। এক ভাগ পাকিস্তানে, অপর ভাগ ভারতে। ১৪ই আগষ্ট তারিখে সকলেই জানত যে, নদীয়া জেলার যে অংশ ভারতে পড়েছে শান্তিপুর সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানকে যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের বিভিন্ন স্থানে তোরণ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। তখন প্রধানতঃ দেবদারু পাতা দিয়ে এসব তোরণ নির্মিত হত। ডাকঘর, বাজার, ষ্টেশন প্রভৃতি জায়গায় বড় বড় বাঁশ পুঁতে পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু গভীর রাত্রে খবর পাওয়া যায় যে, শান্তিপুর নদীয়া জেলার পাকিস্তান অংশের অন্তর্গত হয়েছে। ফলে আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। পনেরই আগষ্ট সকালের মধ্যেই তোরণ ইত্যাদি অপসারিত হয়। জায়গায় জায়গায় পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলিত হয়। মুসলিম লীগের উদ্যোগে ও অবাঙালী মুসলমানদের সহায়তায় উন্মুক্ত তলোয়ার কাঁধে এক শোভাযাত্রা বের করা হয়। অবশেষে ১৭ই আগষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় যে, শান্তিপুর ভারত ডোমিনিয়নের অংশ হয়েছে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরীর মাঠে শান্তিপুরে প্রথম ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এইভাবে শান্তিপুরের পাকিস্তান হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় তা' ভারতে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা খুবই আকর্ষণীয়।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন একটি বিজ্ঞপ্তিতে সরকার বললেন যে, দেশ ভাগ করে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা দেবেন। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় 'বলকানাইজেশন প্ল্যান' বা দেশ ছিন্ন ভিন্ন করার পরিকল্পনা। ঐ ঘোষণায় বলে দেওয়া হল যে, প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর মুসলমান প্রধান জেলা। ২৬শে জুন আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল যে, ইংল্যাণ্ডের বিচারক সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ এ দেশ ভাগ করার জন্য গঠিত কমিশনের প্রধান হবেন। ৩০শে জুন কমিশন কাজ শুরু করে। ঐ কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন বিচারপতি শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি শ্রী বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়. বিচারপতি জনাব আবু সালে মোহাম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি জনাব এস. এ. রহমান। এঁদের বলা হল যে, এই কমিশন বাংলার মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগুরু এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ নিরূপণের দ্বারা বাংলার দুটি অংশের সীমানা চিহ্নিতকরণ করবে। বিরোধ দেখা দিলে অন্যান্য বিষয়গুলিও বিচার বিবেচনা করবে। কমিশনকে

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনটি দেওয়া হল। তাতে যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাকে মুসলমান প্রধান জেলা হিসাবে বলা আছে। অতএব ঐগুলি পাকিস্তানে যাবে তা' মোটামুটি ধরে নেওয়াই হল। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কমিশনের কাছে তাঁদের তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থিত করলেন।

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি বিশ্বাস তাঁদের রায়ে প্রশ্ন তুললেন যে, 'মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান এলাকা চিহ্নিতকরণ করবার কাজে একক বা ইউনিট হিসাবে কাকে গ্রাহ্য করা হবে? প্রত্যেক প্রদেশ কতকগুলি বিভাগে, প্রতি বিভাগ কতকগুলি জেলায়, প্রতি জেলা কতকগুলি মহকুমায়, প্রতি মহকুমা কতকগুলি থানায়, প্রতি থানা কতকগুলি মৌজায়, প্রতি মৌজা কতকগুলি গ্রামে এবং প্রতিটি গ্রাম কতকগুলি পাড়ায় বিভক্ত। প্রদত্ত আইনে (অর্থাৎ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন) প্রদেশকে একক হিসাবে ধরা হয়নি। ধরা হলে সেই অনুসারে কোনো প্রদেশের ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা অনুসারে সেই প্রদেশ কোন্ ডোমিনিয়নে যাবে তা স্থির হয়ে যেত। তাহলে এ কমিশন গঠনের প্রয়োজনই ছিলনা। যেহেতু এই কমিশন গঠিত হয়েছে প্রদেশকে ভাগ করার জন্যই সেক্ষেত্রে কেন জেলাকে একক বা ইউনিট হিসাবে ধরা হবে? একদম নিম্নতম 'একক' পাড়া হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলার সার্ভেয়ার জেনারেল ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অনুসারে পাড়া, গ্রাম বা মৌজার কোনো মানচিত্র সরবরাহ করতে পারলেন না। তাঁরা নিম্নতম পক্ষে থানা অনুযায়ী ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সম্বলিত মানচিত্র দিলেন। তাই কমিশন থানাকেই 'একক' হিসাবে গ্রাহ্য করলেন।'

এইভাবে বাংলার বিভিন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হল। নদীয়া জেলাকে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের পরিশিষ্টে মুসলমান প্রধান এলাকা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কমিশনের এই দুই সদস্য তাঁদের মতামতে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করলেন। তখন নদীয়া জেলায় পাঁচটি মহকুমা ছিল। রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর (সদর), মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া। তাঁরা বললেন, "রাণাঘাট মহকুমার দক্ষিণ অংশ অমুসলমান প্রধান অঞ্চল। ঐ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে ২৪ পরগণার উত্তর দিক বরাবর যে অঞ্চল তাও সম্পূর্ণরূপে অমুসলমান প্রধান অঞ্চল। রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে পাঁচটি থানা আছে। তার মধ্যে তিনটি অমুসলমান-প্রধান এলাকা। রাণাঘাট, শান্তিপুর ও চাকদহ থানা শুধু অমুসলমান-প্রধান এলাকাই নয়—এখানকার তিনটি পৌর শহরই তাদের গঠনে পুরোপুরি অমুসলমান-প্রধান। হরিণঘাটা ও হাঁসখালি থানা মুসলমান-প্রধান এলাকা। কৃষ্ণনগর (সদর) মহকুমারও তিনটি থানা—কৃষ্ণনগর, নাকাশিপাড়া ও চাপড়া অমুসলমান প্রধান এলাকা।

কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট মহকুমাদ্বয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করতে হবে। কারণ এ জায়গাগুলি বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃত

বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। হিন্দুর বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদের উৎসস্থান বলা যায়। তাই এই দুটি মহকুমার কথা পৃথকভাবে চিন্তা করা যায়না। কমিশন শুধু ঐ এলাকার ধর্ম অনুযায়ী লোকসংখ্যা বিচার করবে না। সেই সঙ্গে তার সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীর ধর্মও বিচার করবে। একটি মুসলমান প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে জানানো হয়েছে যে, চাকদহ, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর শহরেই শুধু অমুসলমান জনগণ প্রধান। ঐ সব শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি সবই মুসলমান প্রধান। অতএব শহরগুলিকে বাদ দিয়ে গ্রামগুলিই ধরা হোক্। তাহলে ঐসব এলাকা কোন্ ডোমিনিয়নে যাবে তা স্থির করা খুবই সহজ হবে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এইভাবে কোন্ এলাকার গ্রামাঞ্চলটি কোন্ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য স্থির করে তারপরই বলা হবে ঐ শহরগুলি যেহেতু এদের সংলগ্ন অতএব এগুলিকে ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এটি কোনো সিদ্ধান্তই নয়।"

অপরদিকে বিচারপতি আক্রাম ও বিচারপতি রহমান বললেন : "ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলপথের বেশীরভাগ অংশই মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে। ঐ রেলপথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন হল রাণাঘাট জংশন। অতএব রাণাঘাটের ( মহকুমার ) সবটাই পাকিস্তানে দিতে হবে। তাছাড়া ঐ রেলপথের বড় কারখানা হল কাঁচরাপাড়া ও নৈহাটী ( হালিশহর )। পূর্ববঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোনো রেল কারখানা নেই। অতএব ঐ এলাকা পাকিস্তানে যাওয়া দরকার। সেইসঙ্গে সন্নিহিত টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, বারাকপুর প্রভৃতি এলাকায় মুসলিম জনবসতি প্রচুর। তাই সেই এলাকাও এর সঙ্গে দিতে হবে। পার্শ্ববর্তী হরিণঘাটাও মুসলিম প্রধান। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ পরগণার বারাকপুর থেকে রাণাঘাট মহকুমার সবটাই পাকিস্তানে দিতে হবে।"

এইরকম পরস্পর দুটি বিপরীতমুখী দাবী ও মতামতের ওপর সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৭ তারিখে তাঁর রায় দেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলা মোটামুটি একই মাপের ও একই সীমার মধ্যে ছিল। এই রায়ের পর এটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। ভাগের আগে নদীয়ার মাপ ছিল ২৮০০ বর্গমাইল। ভাগের পর ভারতীয় নদীয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০৯ বর্গমাইল।

র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ তাঁর রায়ে বলেন যে, "গঙ্গা নদীর যে স্থান থেকে মাথাভাঙা নদী বের হয়েছে সেখান থেকে লাইনটি ঐ নদী বরাবর উত্তর মুখে চলবে সেই পর্যন্ত যেখানে দৌলতপুর ও করিমপুর থানার সীমানায় এটি মিশেছে। মূল খালের মাঝের লাইনটিই হবে প্রকৃত সীমা। এই সীমাবিন্দু থেকে লাইনটি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এই থানাগুলির সীমানা বরাবর যাবে :—দৌলতপুর ও করিমপুর ; গাঙ্গানী ও

করিমপুর ; মেহেরপুর ও করিমপুর ; মেহেরপুর ও তেহট্ট , মেহেরপুর ও চাপড়া ; ডুমুরদহ ও চাপড়া ; ডুমুরদহ ও কৃষ্ণগঞ্জ ; চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণগঞ্জ ; জীবননগর ও কৃষ্ণগঞ্জ ; জীবননগর ও হাঁসখালি ; মহেশপুর ও হাঁসখালি ; মহেশপুর ও রাণাঘাট।”

১৪-১৫ই আগষ্ট তারিখে এই রায়ের কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা হল না। মহেশপুর ও রাণাঘাট থানা বরাবর পূর্ববঙ্গের সীমা এই ব্যাখ্যা অনেকে করলেন। তাই ১৫ই আগষ্ট অনেকেই ধরে নেন শান্তিপুর পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে। মুসলিম লীগ এই ব্যাপারে আরও অগ্রসর হয়ে এখানে পাকিস্তানী পতাকা তুললেন। মুসলীম লীগ একটি বাস্তবনীতি বরাবর মেনে চলেছে। সেটি হল গায়ের জোরে কোনো এলাকা দখল করলে পরে আইনগত দখলও পাওয়ার ব্যাপারে সুবিধা হয়। শান্তিপুরের ক্ষেত্রে তারা এই নীতি প্রয়োগ করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এর কোন বিশদ ব্যাখ্যা সংগ্রহ করতে না পেরে শান্তিপুরের বুক থেকে ভারতীয় ডোমিনিয়নের পতাকা অপসারিত করলেন। শান্তিপুর প্রকাশ্যে কিন্তু অঘোষিতভাবে পাকিস্তান হয়ে গেল। শান্তিপুরের বাইরে থেকে মুসলিম লীগের এক-দল নেতা শান্তিপুরে এলেন। একদিনের মধ্যেই তাঁরা এসে এখানকার কোন্ কোন্ বাড়ীতে লীগের অফিস হবে, কোন্ বাড়ীটি মুসলিম লীগের কোন্ নেতা দখল করবেন তা’ স্থির করে ফেললেন। ডাকঘরের জনৈক মুসলিম লীগ নেতার বাড়ীতে (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী ) এই সভা বসে। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট লীগের ছেলেরা মুখে মুখে প্রচার করতে থাকেন যে, লীগ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদি এখানকার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবেই তাদের এখানে থাকতে দেওয়া হবে। তা’ না হলে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই রকম এক অবস্থার মধ্য দিয়ে শান্তিপুরের অধিবাসীদের দুদিন কাটে। অবশেষে ১৭ই আগষ্ট এর পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে বলা হয় যে, প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুসারে শান্তিপুর ভারত ডোমিনিয়নের অংশ। এইভাবে সমগ্র দেশ যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করল তখন শান্তিপুরবাসীরা সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন ১৭ই আগষ্ট তারিখে।

র‍্যাড্‌ক্লিফের নদীয়া সংক্রান্ত রায়ের এই প্রথম অংশটি সকলপ্রকার গোলমালের মূলে। তাই এর নতুন করে ব্যাখ্যা করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সুইডেনের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এ্যালগট্ বাগের নেতৃত্বে আর একটি কমিশনের রায় পেতে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই রাজী হয়। এতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি থাকলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এম. সাহাবুদ্দিন। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হল মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রশেখর আয়ারকে। কোনো বাঙালী বিচারককে অথবা ঐ এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন কোনো

বিচারককে ভারত সরকার নিয়োগ করলেন না। তাঁরা ঐ অংশটির ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ১৯৪৮ সালের আকাশ থেকে তোলা ফটোগ্রাফ অনুসারে জলঙ্গী গ্রামের ক্যাম্প করার জায়গা ও থানার উত্তর-পশ্চিম অংশে বা ঐ জায়গার কাছাকাছি স্থানে গঙ্গা নদী থেকে যে মাথাভাঙা নদী বেরিয়েছে তার খাতের মাঝামাঝি লাইন বরাবর ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা হবে, এবং তারপর দৌলতপুর ও করিমপুর থানার সীমার সর্বোত্তর বিন্দুর দক্ষিণ বরাবর তা' চলবে। মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখের বিন্দুটি গঙ্গানদীর মূল খাতের মাঝামাঝি জায়গার একটি বিন্দুর সঙ্গে সরল এবং হ্রস্বতম রেখা দ্বারা যুক্ত করতে হবে। উপরোক্ত পরবর্তী বিন্দুটি রায় দেওয়ার তারিখে যেরকম ছিল সেরকম নির্ধারিত হবে অথবা সম্ভব না হলে ১নং বিরোধের সীমানা চিহ্নিত করণের তারিখে যেরূপ ছিল সেরূপ হবে। উক্তরূপে নির্ধারিত বিন্দুটি—বিন্দুটিকে সর্বদাই স্থিরবিন্দু হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে—সীমানা রেখার দক্ষিণ পূর্বের সর্বশেষ বিন্দু হবে। এইভাবে নদীয়ার উভয় অংশের মধ্যে বিরোধ মিটল। ভারতীয় নদীয়া জেলাটি প্রথমে নবদ্বীপ জেলা হিসাবে পরিচিত হয়। পরে পাকিস্তানী নদীয়া কুষ্ঠিয়া জেলা ঘোষিত হলে পুনরায় এ অংশের নাম নদীয়া জেলাই হয়। শান্তিপুর ভারতীয় নদীয়ার অংশ হিসাবে স্থায়ীভাবে গণ্য হয়।

# পুরসভার পুরাকথা

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার দেশে পৌর বিষয়ে এক নতুন আইন চালু করলেন। এতে বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন পুরসভা স্থাপনের ব্যবস্থা থাকল। এই আইন চালু হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই শান্তিপুরের কিছু অধিবাসী শান্তিপুরেও পুরসভা স্থাপনের আবেদন করলেন। এঁদের নেতৃত্ব দিলেন জমিদার উমেশচন্দ্র রায় ওরফে মতিবাবু। ইনি একজন বিচিত্র ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। একাধারে অত্যাচারী, লম্পট ও অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত জমিদার। অপরদিকে বিদ্যোৎসাহী, দানশীল ও সকল প্রগতিশীল কাজকর্মে উৎসাহী ব্যক্তি। শান্তিপুরের মতিগঞ্জ ও উমেশনগর তাঁর স্মৃতি বহন করছে। যাই হোক, তাঁদের এই আবেদনের তারিখের সন্ধান পাওয়া যায়না। তবে এটি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে লেখা বলে মনে হয়। কারণ এই চিঠিটি লোয়ার প্রভিন্সের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ উইলিয়াম ডাম্পিয়ার কলকাতায় তদানীন্তন বাংলা সরকারের সচিব সিসিল বিডন সাহেবের কাছে সুপারিশ সহ পাঠান ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী। আবেদনকারী ছিলেন উমেশচন্দ্র রায়, রাধানাথ গোস্বামী, বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কমল প্রামাণিক, রামচন্দ্র দে পোদ্দার, রামতনু লাহিড়ি, গোপীনাথ শেঠ, রামনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক, কৃষ্ণকান্ত প্রামাণিক, দীনদয়াল ( প্রামাণিক ), মহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিবচন্দ্র পাল।

তাঁরা তাঁদের আবেদনে শান্তিপুরে এই আইনের বিধান অনুসারে পুরসভা স্থাপনের দাবীর কারণ হিসাবে বললেন যে, আইন অনুযায়ী পুরসভার যা যা করণীয় তা সব করা হবে। তার মধ্যে তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন যে, দরিদ্র অসুস্থ নাগরিকদের সেবা ও শহরের সীমার মধ্যে কলেরা ও গুটি বসন্ত নিবারণের ব্যবস্থা করা হবে।

আবেদনপত্রটি উপরোক্ত ডাম্পিয়ার সাহেব বাংলার গভর্ণরের কাছে তাঁর সুপারিশ-সহ পাঠিয়ে দিলেন। উক্ত সুপারিশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি লিখলেন যে, এটি শান্তিপুর মহকুমার সদর শান্তিপুর শহরে পৌর-আইন চালু করবার জন্য শহরের কিছু সম্মানিত অধিবাসীর দরখাস্ত। ঐ স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে বেশ কিছু ধনী ব্যক্তিরও স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে। তাঁদের প্রভাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই আইন চালু করতে বিশেষ অসুবিধা হবেনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ শহরে প্রচুর সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁরা যে কোন নতুন জিনিস বা প্রথা চালু করার ব্যাপারে খুবই সন্দিহান। তাছাড়া এইসব ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের শান্তিপুরে বসতবাড়ী থাকলেও কলকাতায় কাজকর্ম করেন। অর্থাৎ কলকাতার

সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে। এটিও মনে রাখা দরকার। তার মানে সম্ভাব্য সকলপ্রকার প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সরকার প্রস্তুত হয়েই অগ্রসর হন।

নির্দেশ দেওয়া হল যে, শান্তিপুরে এই পৌর আইন চালু করার পক্ষে ও বিপক্ষে যেসব অধিবাসী তাঁদের মতামত যেন সংগ্রহ করা হয়। অধিবাসীরা তাঁদের মতামত ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জানাবেন। নোটিশটি ১লা মার্চ, ১৮৫৩ তারিখের সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর বাংলা অনুবাদ শান্তিপুরের কয়েকটি প্রধান জায়গায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়। তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এই মতামত গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ে শান্তিপুর মহকুমার সদর হওয়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস এখানেই ছিল। শান্তিপুরের বর্তমান থানাটি তাঁর অফিস ছিল। মতামত নিয়ে দেখা যায় যে, ১০ই মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল এই একমাস সময়ের মধ্যে ১১৭৪ জন অধিবাসী এই আইন চালু করার পক্ষে মত দিয়েছেন। আর বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৫৪ জন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর প্রতিবেদন নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সি. এফ. মন্টেসরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ প্রতি-বেদনে তিনি সবিস্তারে জানালেন যে, এই মতামত নেওয়ার আগে শহরের সর্বত্র ঢোল বাজিয়ে এই সরকারী নির্দেশের কথা প্রচার করা হয়েছে এবং শান্তিপুরের বিভিন্ন স্থানে সরকারী নির্দেশের ছাপানো বয়ানটি সকলের গোচরে আনবার জন্য টাঙানো হয়েছে, ইত্যাদি। সেইসঙ্গে তিনি শান্তিপুরে ঐ আইন চালু করার সুপারিশ করেন। প্রথম কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করবার জন্য এই ব্যক্তিদের নামও তিনি সরকারে পাঠান : উমেশচন্দ্র রায়, বিন্দুচরণ মুখার্জী, কিশোরীলাল গোস্বামী, রাধানাথ গোস্বামী, কৃষ্ণবল্লভ প্রামাণিক, কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক, ধনকৃষ্ণ গোস্বামী, শিবচন্দ্র পাল, পীতাম্বর রায়, মহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রতিবেদনটি পাঠান ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে।

যখন দেখা গেল শান্তিপুরের প্রায় সকল লোকই এই আইন চালু করার পক্ষে তখন বিরুদ্ধবাদীরা অন্য পথ ধরলেন। তাঁরা ১৮৫৩র এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ১৩ খানি বাংলা ও ইংরাজি দরখাস্ত 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত সুবে বাঙ্গালা প্রভৃতির গবরণর জেনারেল বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষুর' কাছে পাঠালেন। তাঁদের প্রধান আপত্তি হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, এই আইন চালু হলে যে চৌকিদারী ট্যাক্স্ বৃদ্ধি পাবে তা তাঁরা দিতে অক্ষম এবং 'আপত্তি দর্শাইয়া ১০ এপ্রিল তারিখের আমারদিগের নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত অসম্মতির হেতু সম্বলিত শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় হুজুরে দরখাস্ত করনোদ্দত হইলে উক্ত দরখাস্ত গ্রহণ না করিয়া অস্মাদাদিকে ঘৃণিত লোচনে তাড়নাপূর্বক হাজত

কারাগার আবদ্ধের আজ্ঞা প্রদান করিয়া' তাঁদের মত প্রকাশ করতে দেননি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

তাঁদের আবেদনের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"দীন প্রতিপালক টেকস্ হওয়া বিষয়ে অস্মদাদির সর্বপ্রকার অপারগ বিধায় অস্বীকার তাহা নিম্নের কয়েক প্রকরণে লিখিতেছি কৃপাবোলোকনে টেকস নিবারণের আজ্ঞা প্রদান হয়

প্রথম অত্রস্থলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাঁতি এই দুই জাতির অধিকাংশ বসতি ব্রাহ্মণবর্গের যে বৃত্তিভূমি উপজীবিকা ছিল তাহা দোএম কানুনে লোপ হইয়া ভিক্ষোপজীবিকা হইয়াছে তাঁতি জাতিদিগের স্বীয় ব্যবসা এবং এগ্রামে কৃষি কর্ম্মের উপায় না থাকায় অন্যান্য জাতিরাও প্রায় সকলেই তাঁতির ব্যবসায় নিযুক্ত বিলাতি বস্ত্র আমদানি হওয়ায় তাহাতেও সম্পূর্ণ বিঘ্ন হইয়াছে দ্বিতীয় অত্র গ্রামে চাকুরি ব্যবসায়ী মনুষ্য প্রায় নাই অত্যল্প যাহারা এই কর্মে নিযুক্ত তাহারাও স্বীয় সংসারে খরচ নির্ব্বাহ করণাশক্ত

তৃতীয় অস্মদাদির এত কষ্ট ব্রত ধারণ করিয়া এগ্রামে বাসের কারণ পুরুষানুক্রমের বসতি যাহা পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়াছেন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী ইত্যাবধানে মায়াবসত কুত্রাপি গমনে অক্ষম থাকায় তাহারা আহার না করিয়াও কালযাপন করে

চতুর্থ চৌকিদারি অত্যল্প যে কিঞ্চিৎ দেয় হইয়াছে তাহাই দ্বৌমাসান্তে ত্রৈমাসান্তে চৌকিদারগণ গমনাগমন পূর্ব্বক আদায় করে ব্যক্তিবিশেষে ইহাতেও অপারগ হওয়ায় ছয় সাত মাসান্তে চৌকাট কবাট প্রভৃতি বিক্রয় পূর্ব্বক আদায় হইয়া থাকে ইহাতে এগ্রামে টেক্স হওয়া বিবেচনা বহির্ভূত বরং এই টেক্স হইলে ভবিষ্যতে বিবিধ বিঘ্ন হওয়া সম্ভব ভদ্র ২ লোক ভদ্রাসনচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে গমন ব্যক্তি বিশেষে তস্করি প্রভৃতি বিবিধ কুকর্মসালী গ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হওয়াই সর্বপ্রকারে সম্ভব

পঞ্চম অত্র মহকুমার লা সাহেব ও ব্রোণউড সাহেব প্রভৃতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যিনি যখন আসিয়াছিলেন সর্ব্বতোভাবে প্রজালোকের হিত ও সদ্বিচার ও তস্করাদির শাসন করায় আমরা কি পর্য্যন্ত সুখে বসতি করিয়াছি অদ্যাপিও তাঁহারদিগের গুণ কির্ত্তনে ও প্রত্যাগমন প্রত্যাশে কালযাপন করি

অধুনা অস্মদাদির দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘোষাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের শুভাগমনাবধি উপস্থিত টেক্সের আইনজারি করণাভিলাষে যে কৌশল ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য কেননা হাকিমান সভা কি পঞ্চায়েত প্রভৃতি ভদ্র ২ সভায় মন্ত্রণাকরণ আবশ্যক হইলে সেই ২ মহালের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়েস্থ প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য যাহা বিবেচনাসিদ্ধ

হয় তাহাই হইয়া থাকে প্রশংসিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় শান্তিপুরের অন্তর্গত মহাল রামনগর রঘুরামপুর বেড় চৈতলপাড়া নপাড়িপাড়া বেজপাড়া বিভুপাড়া পোলতা পাড়া এই কয়েক মহালের মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়েস্থ প্রভৃতি বহুতর বিজ্ঞলোগ থাকিতেও প্রামাণিক উপাধি তিলি বালক তিনটি তন্মধ্যে বালকদ্বয় অদ্যাপিও পাঠদ্দশায় তাহারদিগের লইয়া ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পল্লীস্থ সধনী মনুষ্য কয়েকজনকে ডাকাইয়া মতলবমত স্বীকার করাইয়া কমিটি সিদ্ধ পূর্ব্বক হুজুর কৌন্সেলে প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাহারদিগের স্বীকার হওয়ার হেতু সর্ব্বদা ঐ মহকুমায় মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে অস্বীকার অপরাধে তৎ তৎ বিষয়ে অহিত করেন অত্রাশঙ্কায় ও অনুরোধে বিশেষ উক্ত ব্যক্তিরা সধনি মাসিক কিঞ্চিৎ ব্যয়ের সক্ষম ইত্যাদি বিবেচনায় স্বীকার করা ভিন্ন অন্য কি বোধ হইতে পারে

ষষ্ঠ এই ক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় শান্তিপুরস্থ প্রজাদিগের ধৃত করিয়া বলপূর্ব্বক ভয় দর্শাইয়া তাহারা অস্বীকার থাকাতেও স্বীকারের বহিতে দস্তখত করাইতেছেন ইহাতেই অস্মদাদির সসঙ্কিত হইয়া দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থিত যে

উপরিবর্ণিত কয়েক প্রকরণের প্রমান আমারদিগের স্থানে লইয়া অথবা জেলা নদীয়ার মহামান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত জজসাহেব বাহাদুরের দ্বারা তদন্ত করিয়া অধীন প্রজাদিগের ১৮৫০ সালের ২৬ আইন জারী নিবারণ করিয়া টেক্স দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়ার আজ্ঞা প্রদান হয় ইতি সন ১৮৫৩ সাল ১ এপ্রিল।"

অনুরূপভাবে 'সাকিন শান্তিপুরের সুতরাগড়ের পাড়ার প্রজাসমূহ' এই আইন প্রচলন বিষয়ে কয়েকখানি দরখাস্ত পেশ করেন। সরকার সব দরখাস্তগুলি পাঠিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বক্তব্য জানতে চাইলেন। তিনি খোলাখুলি ভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন।

তিনি বললেন, 'যাঁরা এই পৌর আইন চালু করার পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁরা সকলেই ভদ্র ও সম্মানীয় শ্রেণীর। এই আইন চালু হলে তাঁদেরই বেশী ট্যাক্স দিতে হবে। তাঁদের মধ্যে মুসলমান, ব্রাহ্মণ, তাঁতী, কাঁসারী, বেনে, তামলি, দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী ও পাইকারী ব্যবসাদার—সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। এঁরা সকলে প্রকাশ্য স্থানে তাঁদের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দেন। এইজন্য একটি আলাদা খাতা রাখা হয়েছিল। অনুরূপভাবে যাঁরা এর বিরোধী তাঁরাও প্রকাশ্য স্থানে আলাদা খাতায় তাঁদের স্বাক্ষর দেন। আমার জ্ঞানতঃ কোন মতাবলম্বীই তাঁর বিরোধীদের কাছ থেকে কোনরকম বাধা পাননি বা তাঁদের ভয় দেখানোও হয়নি।' নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের এই চিঠিখানি লোয়ার প্রভিন্সের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে পাঠাবার সময়ে লিখলেন যে, 'আমার বিশ্বাস সব আবেদনই শান্তিপুর শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি গোষ্ঠী—বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণেরা—সরকারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

নিজেদের জাতের স্ববাদে এতদিন এইসব ব্রাহ্মণদের বর্তমান চৌকিদারী কর দিতে হত না। নতুন নিয়মে মফঃস্বলের অন্যান্য গ্রামবাসীদের মত তাঁদেরও এই চৌকিদারী কর দিতে হবে। যাই হোক্ সরকারের নির্দেশ পেলে আমি শান্তিপুর গিয়ে সকলের মতামত নেব।'

১৮৫৩ সালের ৭ই জুন হেনরী বুরিং লফোর্ড নামে একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে শান্তিপুরে নতুন করে মতামত নেওয়ার জন্য পাঠানো হল। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই তিনি শান্তিপুরের আধিবাসীদের মতাম৩ গ্রহণ করলেন। প্রায় ৫০০।৭০০ লোক প্রতিবাদ জানাতে এলে লফোর্ড তাদের নাম ও ঠিকানা লিখে নিতে লাগলেন। দেখা গেল অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর ছেলে ছোকরা আর তাদের কোন ঘরবাড়ীই নেই। মাত্র একজন ব্রাহ্মণ এইসঙ্গে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে তারা একখানা দরখাস্তও জমা দেয়। দরখাস্ততে যথারীতি বলা হয় বিরোধীরা যাতে তদন্তকারী অফিসারের সামনে না আসতে পারে তার জন্য লাঠিয়াল, বরকন্দাজ ও পুলিশ দিয়ে তাদের বাধা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আর একটি অভিযোগ যে, শান্তিপুরের একজন ধনী জমিদার মতিবাবুর সঙ্গে যোগসাজসে এখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকজন দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা আনায় আর ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি। তাই আবার আর একজনকে দিয়ে তদন্ত হোক্।

সরকার এই সমস্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করে বললেন যে, অশিক্ষিত কিছু লোকের নাম অন্য ব্যক্তিরা লিখে এই সব যে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন তার কোন গুরুত্ব নেই। শান্তিপুরের ধনী, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বিরাটসংখ্যক ব্যক্তির দাবী অনুযায়ী এই পৌর আইন প্রবর্তনের পথে ঐ সব দরখাস্ত কোনরকম বাধা সৃষ্টি করবেনা। কিন্তু বিরোধীরা এতেই থেমে যাননি। ঐ বছরের ১৮ই জুলাই আবার আর এক খানি গণদরখাস্ত তাঁরা সরকারের কাছে পাঠালেন। দেখা গেল তাঁদের দরখাস্ত একরকম কাগজে আর স্বাক্ষরগুলি অন্যরকম কাগজে। অর্থাৎ অন্য কোন কারণে সই করিয়ে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। সরকার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাল গণ দরখাস্ত বাতিল করেন।

অবশেষে ১৮৫৩ সালের ৬ই আগষ্ট সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বললেন যে,

"যেহেতু নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে ১৮৫০ সালের ২৬ আইন চালু করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল ;

এবং যেহেতু শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জানিয়েছেন যে, শান্তিপুরের জনসাধারণের বৃহৎ অংশ শান্তিপুরে ঐ আইন চালু করার পক্ষে ;

অতএব নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে উক্ত আইনের ২ ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের জন্য শান্তিপুরবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী মহানুভব সরকার

বাহাদুর নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে উক্ত আইন চালু করার নির্দেশ দিলেন।" সেই সঙ্গে আর একটি পত্রে শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরে এই আইন প্রবর্তনের জন্য যে ভাবে পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছেন তারও ভূয়সী প্রশংসা সরকার করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের পরামর্শমত সরকার শিবচন্দ্র পাল ও কৃষ্ণবল্লভ প্রামাণিক-কে শান্তিপুরের প্রথম কমিশনার নিযুক্ত করেন। ১৮৫৩ সালের ১লা অক্টোবর শান্তিপুর পুরসভার প্রথম সভা বসে। সভাপতিত্ব করেন মনোনীত চেয়ারম্যান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল। উপস্থিত থাকেন ঐ দুই কমিশনার।

১৮৮৫ সালের নতুন পৌর আইন অনুসারে শান্তিপুর পুরসভায় প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে কমিশনার নিয়োগ আরম্ভ হয়। নির্বাচিত কমিশনারদের ক্ষমতা ও অধিকার খুবই ব্যাপক ছিল। অবশ্য চেয়ারম্যান পদটি মহকুমা শাসকের কাছেই থাকত। এইসব নির্বাচিত কমিশনারদের ক্ষমতার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নতুন পৌর আইন চালুর পর থেকেই শান্তিপুরে কুয়া পায়খানার বদলে খাটা পায়খানা প্রবর্তনের চেষ্টা চলে। কিন্তু নির্বাচিত সদস্যরা শুধু করভার বৃদ্ধি পাবে এই কারণে এই খাটা পায়খানা স্থাপনের প্রস্তাব বার বার ভোটের মাধ্যমে পরাজিত করেন। এমনকি তৎকালীন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার ওয়েষ্টম্যাকট কিভাবে পায়খানার জল পানীয় জলকে দূষিত করে তা বোঝাবার জন্য শান্তিপুরে আসেন এবং নির্বাচিত কমিশনারদের খাটা পায়খানার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই নির্বাচিত কমিশনাররা খাটা পায়খানা স্থাপন করতে দেননি। অবশেষে সরকার পুরসভার সব ক্ষমতা মহকুমা শাসককে দিয়ে দিলে তাঁর নির্দেশে তবে শান্তিপুরে কুয়া পায়খানা বাতিল করে খাটা পায়খানা চালু করা যায়।

এসব সত্ত্বেও এটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শান্তিপুরের পুরসভা প্রাচীনতার দিক দিয়ে বাংলার মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীন পুরসভা। এটি খুবই শ্লাঘার বিষয়।

# চৈতন্য-সম্ভব

চৈতন্যদেব বিশ্বের বিস্ময়। যে গভীর ভাবাবেগ একটি সমগ্র জাতিকে পাঁচশ'-বছরের বেশী সময় ধরে আন্দোলিত করছে তার প্রধান পুরুষ চৈতন্যদেব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর আবির্ভাব কোন অলৌকিক বা আকস্মিক ঘটনা নয়। অথবা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত বাণী 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র জন্য ভগবানের নব-আবির্ভাব নয়। বিশ্বম্ভরের গৌরাঙ্গে এবং গৌরাঙ্গের চৈতন্যে রূপান্তরণ শান্তিপুর-নাথ অদ্বৈতাচার্যের একটি দীর্ঘদিনব্যাপী পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের রূপায়ণ। এবং ইতিহাসই প্রমাণ করেছে যে, এই পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের রূপায়ণ অত্যন্ত সফল ও যথোপযুক্ত হয়েছিল। অদ্বৈতাচার্যের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে দীর্ঘ ১২৫ বৎসর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চৈতন্যদেব তাঁকে 'গুরু', 'আচার্য', 'গোসাঞি', 'বাউল', 'নাঢ়া', প্রভৃতি বলে সম্বোধন করতেন এবং অদ্বৈতাচার্যের আহ্বান ও প্রচেষ্টা যে তাঁর আবির্ভাবের কারণ তা বার বার স্বীকার করেছেন। সমগ্র জীবনব্যাপী চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির আধার বলে গণ্য করতেন।

বিশ্বম্ভর বা চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জন্মের প্রায় একান্ন বছর আগে অদ্বৈতাচার্য (১৪৩৫ খ্রীঃ), পঁয়ত্রিশ বছর আগে হরিদাস (১৪৫০ খ্রীঃ) ও আট বছর আগে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের জন্মের আগে থেকেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব আন্দোলন সীমিতভাবে প্রচলিত ছিল। মোটামুটিভাবে হিন্দুশাস্ত্র পঠন, আলোচনা ও সেইসঙ্গে কীর্তন এই আন্দোলনের অংশ ছিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তপ্রায়। তার জায়গায় রাজধর্ম ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে। দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে বা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজশক্তি পাঠান, মোগল তখনও বাংলায় আসেনি।

একদিকে যেমন ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় দলে দলে হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ নানা বিধি-নিষেধের আড়ালে নিজেকে ঢেকে দিতে উদ্যত। উদারতাবোধ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত। ফলে ইচ্ছা থাকলেও কোন অহিন্দুর পক্ষে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব ত' ছিলই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন হিন্দু কণামাত্র অহিন্দুসুলভ আচরণ করলেই তাকে হিন্দুধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হত। অপরদিকে বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাঁদের অলৌকিক কাহিনীর গল্পে সকলে মত্ত—পুরুষকার বা স্বীয় বুদ্ধিমত্তা অথবা ক্ষমতার জোরে কিছুর সমাধান করবার মত শক্তি সমাজজীবন থেকে অন্তর্হিত। সামগ্রিকভাবে

সমাজজীবনের এক তমসাপূর্ণ সময়। এই সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে কি করে হিন্দুসমাজ তথা সমগ্র সমাজজীবনকে রক্ষা করা যায় তার জন্য সমকালীন কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন।

কমলাক্ষ—পরবর্তীকালে অদ্বৈতাচার্য নামে পরিচিত ব্যক্তিও এইসব চিন্তাশীলদের অন্যতম। যখন তিনি হিন্দু ধর্মের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত সেই সময়েই তাঁর মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে দেখা হয়। সেখানেও অদ্বৈতের একই কথা—সর্বত্রই দেখি ম্লেচ্ছাচার, 'কৈছে জীবোদ্ধার হইব না পাঁও সন্ধান'। এই চিন্তা অদ্বৈতকে উন্মাদ-প্রায় করে তোলে। সকলের কাছেই তিনি পথ খুঁজছেন—উপায় জানতে চাইছেন! মাধবেন্দ্র তাঁর সাধনায় আরও উৎসাহ জুগিয়েছেন। অদ্বৈত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল। তিনিই সমাজ জীবনের কল্যাণের পথ খুঁজে বের করতে পারবেন। 'পুরী কহে কমলাক্ষ তুমি দয়ানিধি। জগতের হিত লাগি ভাব নিরবধি'।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই পথের সন্ধানে তপস্যা করছেন। 'কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা। জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে আসিলা॥' এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে এ সময়ে অদ্বৈতের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। অবশ্য তিনি বয়সের ভাবে ন্যুব্জ নয়—অত্যন্ত বলশালী। তাঁর 'সিংহবাহু সিংহগ্রীব, সিংহের হুঙ্কার।' তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। 'মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি যেন মহা রুদ্র-অবতার।' এসব সত্ত্বেও তিনি শুধু পথের সন্ধান দিতে পারেন—যা তাঁর জীবনভোর সাধনার সঞ্চয়। কিন্তু সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার মত সার্বিক যোগ্যতা তাঁর নেই। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। অথচ জাতিকে বাঁচাতে আন্দোলনকে সফল করতে নেতা চাই। তাই পথ সন্ধান করেই, আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করেই তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত হবে না; তাঁকে নেতাও খুঁজতে হবে। এই তাঁর সাধনা, এই তাঁর সংকল্প। মাঝে মাঝে অস্থির অদ্বৈত আর অপেক্ষা করতে পারেন না, নেতা না পাওয়া যায় 'আমিই দেহ থেকে চারিভুজ বের করে চক্র হাতে নিয়ে পাষণ্ডীদের কাটব' বলে ওঠেন। তবুও তাঁর নেতা খোঁজার বিরাম নেই। 'হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে'। এই কৃষ্ণই হলেন তাঁর আন্দোলনের নেতা। কৃষ্ণ কোন দেবতা বা আকাশচারী ব্যক্তি নয়—নেতৃত্বগুণসম্পন্ন মাটির একজন মানুষমাত্র। চরিত গ্রন্থকারেরা ভক্তিবশে অনেকক্ষেত্রে এঁর ওপর স্বর্গ মহিমা আরোপ করেছেন। এত হুঙ্কার সত্ত্বেও অদ্বৈত কিন্তু কোন উগ্র স্বভাব ব্যক্তি নয়। 'স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।'

তাঁর দীর্ঘ সাধনার ইতিহাসে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্ম তথা সমাজজীবন রক্ষার জন্য তিনি তিনটি পথের নির্দেশ দেন। প্রথমতঃ রাজশক্তির বিরুদ্ধে, তাদের অন্যায়-

অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত যে মানসিক শক্তি সেকালের সমাজ হারিয়ে ফেলেছিল তা আবার সকলের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। এটি হবে প্রতিরোধের এবং প্রয়োজন হলে প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুধর্মের বিস্তার সাধন করতে হবে। স্বভাবতঃই অহিন্দু বলতে তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরই বোঝাত। এর মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া ব্যক্তিও ছিলেন। এদের ও সেইসঙ্গে আদি মুসলমানদেরও হিন্দু ধর্মের গণ্ডীতে আনবার চেষ্টা করতে হবে। সেটি কোন গায়ের জোর বা প্রলোভনের দ্বারা নয়। ভালবাসার দ্বারা তাদের হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাতে হবে। আর তৃতীয়তঃ হিন্দুধর্মের মধ্যে নারী, শূদ্র ইত্যাদি যারা সেই সমাজ কর্তাদের চোখে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর তাদেরও হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠানের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। সমাজের এই বৃহত্তম অংশ তৎকালীন সমাজ কর্তাদের কারসাজিতে প্রকৃতপক্ষে সকলপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে সমাজের এই বৃহত্তম অংশ হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছিল। আর সমাজ হারিয়ে ফেলছিল তার মূল-শক্তিকেই। আর একটি জিনিস লক্ষ করা গেল। জাঁকজমকপূর্ণ পূজানুষ্ঠান বা কঠোর নিয়ম-সম্বলিত অর্চনাবিধি এইসব অহিন্দু বা অন্ত্যজ শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য হবে না। অত্যন্ত সরল নামগান এঁদের পক্ষে অতি উপযুক্ত পন্থা। আর একটি বাধা এই আন্দোলনের পথে সে সময় প্রায় দুরতিক্রমণীয় ছিল বলা চলে। সেটি হল তৎকালীন সমাজ কর্তা ব্রাহ্মণ সমাজ। তাঁদের কাজ ছিল একটি গণ্ডীর মধ্যে ধর্মকর্ম আবদ্ধ রেখে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। এরজন্য রাজশক্তির সঙ্গে একটি আপোষ-রফা গড়ে তুলে তারা নিজেদের কার্যসিদ্ধি করত। সমাজজীবনকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁদের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। অবশ্য সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজই এই দলভুক্ত ছিলেন না। অদ্বৈত প্রতিপত্তি-গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ সমাজের অবিচার, অনাচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন।

এই সময়েই তিনি পেলেন হরিদাসকে। ধর্মে যবন বা মুসলমান। দেহাকৃতিতে মনে হয় হয়ত বা পাঠান-সন্তান। জ্ঞান-আহরণের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতের কাছে এলেন। অদ্বৈত যেন অভাবিতভাবে তাঁর চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ প্রথম প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। তিনি নিজ গৃহে তাঁকে একজন খাঁটি বৈষ্ণব করে তুললেন।

> 'এত কহি তার মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া।
> তিলক তুলসীমালা দিলা পরাইয়া॥
> কটিতে কৌপিনডোর দিলেন বান্ধিয়া।
> হরিনাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥'

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাঘাত শুরু হল। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ এই অহিন্দুকে গৃহে রাখা, তার সঙ্গে ভোজন করা, তাকে দিয়ে হিন্দুধর্ম অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ

করানোর বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। হয় হরিদাসকে এখনই তাড়াতে হবে, নয়ত' অদ্বৈতকেই সমাজচ্যুত করা হবে। অদ্বৈত এইবার তাঁর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলেন। হরিদাস সমাজ-কর্তাদের এই আক্রমণের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করলেন। তাঁকে বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য অদ্বৈতকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অদ্বৈত তাঁর পথ থেকে সরবেন না, একই কথা। এই অসাম্য, এই কূপমণ্ডুকতা দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি নিজের অভীষ্ট কর্মপন্থা থেকে কি করে দূরে থাকবেন? তিনি হরিদাসকে হিন্দুধর্মের চরম সম্মান দিলেন। নিজ হাতে মাতৃ শ্রাদ্ধের পর সেই অন্ন তাঁকে ভোজন করালেন।

'হরিদাস কহে গোঁসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন ॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ ॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥'

অতঃপর হরিদাসও অদ্বৈতের একই মতের একই পথের পথিক হয়ে উঠলেন। এই অভীষ্ট আন্দোলনকে সফল করবার জন্য তিনিও নেতৃত্বের সন্ধানে আকুল হয়ে উঠলেন।

'হরিদাস করে গোঁফায় নাম সংকীর্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন ॥'

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত হরিদাসকে নিয়ে নবদ্বীপে এসে টোল খুললেন। অর্থাৎ তখন তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সী। এত বয়সে হঠাৎ টোল খুললেন কেন? তাঁর উদ্দেশ্য কি অর্থোপার্জন ছিল? কিন্তু ইতিহাস বলে তাঁর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। তাহলে কি নিছক জ্ঞানদানের জন্য? তাহলে এত বয়সে কেন? অল্প বয়সেই ত' খুলতে পারতেন। তাছাড়া আবার কিছুদিন পরেই ত' এই টোল তুলে দিয়ে শান্তিপুরে ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে মনে হয় তিনি দুটি উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ আসেন। প্রথমতঃ নবদ্বীপবাসী শ্রীবাস ইত্যাদি বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করা অর্থাৎ স্বীয় মতানুযায়ী দল তৈরী করা। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল নেতার সন্ধান। টোলে নানা যুবক আসবে। তাদের মধ্য থেকে যোগ্য যুবকের—অভীষ্ট নেতৃত্বের চয়ন। চরিতকাররা বলেছেন অদ্বৈত 'টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া।' কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি টোল খোলেন তারও এক বছর আগে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। আর গৌরাঙ্গ

ত' পাঁচ বছর বয়সের আগে পড়তে আসবেন না। তাহলে ছ' বছর আগে থেকে টোল খোলার উদ্দেশ্য কি? আসলে তাঁর টোল শুধু 'গৌরাঙ্গ' নামক ব্যক্তির জন্য খোলেন নি। এখানে 'গৌরাঙ্গ' অর্থে যোগ্য ব্যক্তি যিনি নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হবেন।

নবদ্বীপে তিনি বৈষ্ণবদের সংগঠিত করতে লাগলেন। সঙ্গে হরিদাস। দিনে সংকীর্তন নিষিদ্ধ। রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীতে সংকীর্তন হয়। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। কারণ হরিনাম করার অপরাধে সকল হিন্দুর শাস্তি দিতে পারে পাঠান বাদশাহের কর্মচারীরা। অতএব 'পাষণ্ডী' ব্রাহ্মণরা বাঁচবার স্বার্থে শ্রীবাসের বাড়ী ভেঙে গঙ্গায় ফেলে দেবার উদ্যোগ নিল। এবার অদ্বৈত এগিয়ে এসে দ্বিতীয়বার তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে এলেন। এখনও তিনি নেতা পাননি। প্রয়োজনে নিজেই নেতৃত্ব দেব—যদিও তিনি প্রৌঢ়ের পর্যায়ে। উপায় কি? এত আকুতি, এত চেষ্টা সত্ত্বেও নেতা যোগাড় করতে পারেন নি।

'শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধ অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর॥
সভা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণ ভক্তি তোমা সকলেয়া॥
যবে পাবো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীর কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস॥'

এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু তিনি নেতা যোগাড় করতে পারেন নি। চঞ্চল সাধনা, চঞ্চল সন্ধান। কত ছাত্র, কত শিশু, কত যুবক তাঁর টোলে এল। তবুও যোগ্য নেতা পাওয়া গেলনা। বালক বিশ্বম্ভর পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্য ছ'বছর যখন বয়স তখনও উলঙ্গ অবস্থায় টোল থেকে তার দাদাকে ডাকতে আসত। কতবার তাকে দেখেছেন। একবারও তাকে ভগবান বলে মনে করে তার পা মাথায় তুলে নেননি। অথচ পরবর্তীকালে সেই বালক যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলে তার পা মাথায় তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ তখন তার নেতৃত্বের যোগ্যতা এসেছে। 'শ্রীকৃষ্ণ' অর্থে নেতাকেই তিনি আহ্বান করেছেন।

এই বিশ্বম্ভর নবীন যুবক। সে পণ্ডিত, সুবক্তা এবং বিবাহিত। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ভাল ছিলনা। ব্যভিচার সমাজদেহের অঙ্গে অঙ্গে। তাই জনসাধারণের মানুষ হতে হলে, তাদের নেতা হতে হলে বিবাহিত হওয়া অবশ্য

প্রয়োজন ছিল। তা না হলে জনগণের বিশ্বাসভাজন হওয়া দুরূহ ছিল। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দও বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করেন। ব্যতিক্রম শুধু হরিদাস। যাই হোক সব মিলিয়ে তিনি দেখলেন বিশ্বম্ভরের নেতৃত্বের গুণ আছে। শুধু দাম্ভিক, তার্কিক। গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ দিয়ে ফিরে এসে সেই দাম্ভিক বিশ্বম্ভর হয়ে যান পরমবিনয়ী। সহসা অদ্বৈত যেন হাতে চাঁদ পেলেন। যে নেতার সন্ধান তিনি এতদিন করেছেন এবার তাকে পেলেন—তাঁর সাধনা সফল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এনে যোগ্যস্থানে বসালেন। নেতার মনে স্বীয় যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে তার পা নিজে মাথায় তুলে নিলেন। তার অভিষেক করা হল। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭৫। আর বিশ্বম্ভর মাত্র ২৫। এইভাবে বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতা হিসাবে চৈতন্যের আবির্ভাব—এইভাবে চৈতন্য-সম্ভব। বিশ্বম্ভর ভিন্ন অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি পেলে হয়ত তাঁকেই বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বের পদে বরণ করতেন—তাঁকেই 'শ্রীকৃষ্ণ' হিসাবে গ্রহণ করতেন। নির্বাচিত নেতাকে বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে মিশবার সুযোগ দিতে, নিজেকে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবার সময় দিতে অদ্বৈত নবদ্বীপ ছেড়ে শান্তিপুর চলে এলেন।

এখানেই অদ্বৈত নেতাকে ছেড়ে দেননি। তিনি নেতাকে দিয়ে পরিষ্কার অঙ্গীকার করিয়ে নেন—'স্ত্রী, শূদ্র আদি যত মূর্খেরে' ভক্তি দিতে হবে। যারা বিদ্যা, বংশ বা আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত তারা অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরুক। আচণ্ডাল সকলের মধ্যে সংকীর্তন ছড়িয়ে দিতে হবে।

তবুও বিদ্বান, জ্ঞানতপস্বী বিশ্বম্ভর হয়ত' বা মনের অগোচরে ক্রমশঃ ভক্তিমার্গ ছেড়ে, কর্মোদ্যম ছেড়ে জ্ঞানমার্গের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন—অদ্বৈতের বড় ভয়। তাঁর সমস্ত জীবনের সংকল্প আর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই নিজে ইচ্ছে করে জ্ঞানমার্গই বড় বলে নেতাকে বোঝালেন। ক্রুদ্ধ নেতা চৈতন্য বলে ওঠেন—তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছ ভক্তিমার্গের। আর এখন জ্ঞানমার্গ বড় বলে প্রচার হচ্ছে। তাকে পিঁড়া বা রোয়াক থেকে ফেলে মারতে লাগলেন। অদ্বৈত গৃহিণী অদ্বৈতকে বাঁচালেন। অদ্বৈত কিন্তু খুশি হলেন। আনন্দে চৈতন্যকে অভিবাদন করলেন। অর্থাৎ তোমার কাছে জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড়—এই তত্ত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

এই নেতাকে সর্বপ্রকার আপদ-বিপদের হাত থেকে রক্ষা করাও যে তাঁর দায়িত্ব তা' অদ্বৈত জানতেন। কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী হলেও উপযুক্ত নেতার অভাবে আন্দোলন করা যায় না। নেতা পাওয়া খুবই দুরূহ। তাকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। তাই যখন কাজীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাজীর বাড়ী আক্রমণ করা স্থির হল তখন স্বাভাবিকভাবেই নেতা আগে নেতৃত্ব দেবেন এইটিই অভিপ্রেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে

বিপরীতরূপ দেখা গেল। নেতা শ্রী চৈতন্য সকলের পেছনে। তাঁকে দুপাশে আগলে রেখেছেন সদল নিত্যানন্দ ও গৌরদাস। তার আগে একদল কীর্তনীয়া সহ শ্রীবাস। তারও আগে আর একদল বৈষ্ণব সহ হরিদাস। আর সর্বাগ্রে কীর্তনের দলসহ অদ্বৈত। অর্থাৎ আক্রমণ যদি আসে তাহলে পর্যায়ক্রমে অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস পর পর তার আঘাত সহ্য করবে। তারও পরে নেতা এবং তাকে পাহারা দিচ্ছে দুজন—নিত্যানন্দ ও গৌরদাস। নেতাকে রক্ষার জন্য কি রকম চেষ্টা!

সেইসঙ্গে এই তরুণনেতার মনে আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন অদ্বৈত। সব বৃদ্ধদের কাছে বিশ্বম্ভর নিতান্তই তরুণ। এতবড় আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবেন কিনা এই সংশয় যেন তাঁর মনে না আসে তার জন্য কত প্রস্তুতি। সকলেই তাঁকে ভগবানের অবতার বলে প্রণাম করলেন। অথচ এই 'অবতার' কে তাঁরা উলঙ্গ অবস্থা থেকে দেখেছেন। তখন কিন্তু তাঁকে তাঁরা প্রণাম করেন নি। কিন্তু এখন তাঁর আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য এটি প্রয়োজন—যাতে তাঁর মনে সর্বদা 'অবতার' হিসাবে কর্মক্ষমতার ব্যাপকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায়। পরে দেখি তিনি বার বার নিজেকে 'অবতার' হিসাবে ঘোষণা করছেন এবং তিনি সব কিছু করতে পারেন তাও ঘোষণা করছেন। বাইশবাজারে কাজী হরিদাসকে চাবুক মারলে এবং পরে কাজীর বাড়ী আক্রমণকালে তিনি বার বার 'চক্র লইয়া কাটিম্ মাথা' এবং 'চক্র' 'চক্র' বলে চীৎকার করতে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে তা' সম্ভব হয়নি।

যখন বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপাধি নিচ্ছেন তখনও মনে হয় তাঁর মনে সংকোচ ও দ্বিধা ছিল। তাই তিনি অদ্বৈতের কাছে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের খবর গোপন রাখতে বলেন। কারণ তিনি তাঁর নেতৃত্ব-অভিষেকের মর্যাদা থেকে সরে আসছেন। যে ভক্তিযোগের সাহায্যে সাধারণ মানুষের মুক্তির চেষ্টা করবেন বলেছিলেন তার বদলে আত্মমুক্তির উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস নিচ্ছেন—এই সংশয়, এই দ্বিধা মনের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। তাই পরে দেখি সরাসরি অদ্বৈতের সামনে এসে দাঁড়াবার মত মনের জোর তাঁর ছিল না। গেলেন আগে হরিদাসের কাছে। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে অদ্বৈতের কাছে এলেন। আর অদ্বৈত এই সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে তিনদিন অচৈতন্য হয়ে রইলেন। তাঁর এতদিনের স্বপ্ন, সাধনা, চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল? যে নেতাকে তিনি তৈরী করেছিলেন সর্বসাধারণের মুক্তির জন্য সেই ব্যক্তি নিজের আত্মমুক্তিকেই মোক্ষ মনে করল?

আরও পরে দেখি নিত্যানন্দের নেতৃত্বে যখন আন্দোলন মূলস্রোত থেকে অন্য খাতে এগিয়ে যাচ্ছে তখনও অতিবৃদ্ধ অদ্বৈত চৈতন্যকে প্রহেলিকার মাধ্যমে সব খবর দিচ্ছেন এবং আন্দোলনের দুরবস্থার কথা জানাচ্ছেন:

'বাউলকে কহিহ লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিহ হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ ইহা কহিয়াছে বাউল॥'

আর চৈতন্যদেব এই বৃদ্ধের কাছে সব জেনে উন্মাদ প্রায় হয়ে গেলেন। মনে হয় তাঁর মনে অনুশোচনা হয়েছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তা যে ভুল হয়ত বা অন্যায় হয়েছিল এই আত্মগঞ্জনা তাঁর মনকে পীড়িত করেছিল। তাঁর তৎকালীন ক্রিয়াকলাপই তার প্রমাণ দেয়। তিনি মেঝেতে মুখ ঘষতে থাকেন, মুখ ফালা ফালা করে কেটে ফেলেন, 'গলা ধরি প্রলাপণ' করতে থাকেন, কখনও বা একা গুম হয়ে বসে থাকেন। কিন্তু তাঁর আর কিছুই করার নেই।

অদ্বৈতাচার্য তাঁর দীর্ঘ সাধনা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও মহান ত্যাগের দ্বারা এক তীব্র আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করেন। তার নেতৃত্বপদে অন্যদের চেয়ে যোগ্যতর বিশ্বম্ভরকে বসান এবং এইভাবে চৈতন্য-সম্ভব ঘটান। শান্তিপুর-নাথ অদ্বৈতাচার্য একাকী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতাকে নির্বাচন করেছিলেন এবং সমগ্র জাতির ভাবাবেগকে রূপ দিয়েছিলেন।

# প্রবাদের শান্তিপুর—শান্তিপুরের প্রবাদ

প্রবাদবাক্য একটি জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। বাংলা প্রবাদ বাক্যের তালিকা দীর্ঘ। সেই তালিকায় শান্তিপুর একটি বিশিষ্ট নাম। শান্তিপুরের প্রাচীনতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশিষ্টতা বাংলা প্রবাদের অঙ্গনে তাকে এই আসন দিয়েছে। অনুরূপভাবে শান্তিপুর তার স্বকীয়তায় কিছু নিজস্ব প্রবাদবাক্য তৈরী করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত বা এদের প্রচলন শান্তিপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবুও সব প্রবাদই আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী। শান্তিপুরকে জানতে ও বুঝতে শান্তিপুরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং শান্তিপুরের সৃষ্ট প্রবাদ বাক্যগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন।

## প্রবাদের শান্তিপুর

### (১) শান্তিপুর রসের সাগর, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর

শান্তিপুর তার রসিকতার জন্য বিখ্যাত। শান্তিপুরের প্রতি পাড়াতেই এরকম রসিক লোক একসময়ে প্রচুর ছিলেন। বর্তমানে জীবনযাত্রার জটিলতার কারণে এঁদের সংখ্যা কমে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। যেকোনো বিষয়ে ছড়া কাটা বা অতি কঠিন বিষয়টিকে হাস্যরসের মাধ্যমে হাল্‌কা করে দিতে শান্তিপুরবাসী সিদ্ধহস্ত। এখানকার 'নহব', 'তরজা' 'ঢেঁকির গান', 'ময়ূরপঙ্খীর গান' প্রভৃতি এই রসিকতারই প্রকাশমাত্র। শান্তিপুরে রসিকদের প্রাচুর্যের জন্যই এই প্রবাদবাক্য।

### (২) তাঁতী, গোঁসাই, পচাভুর, এই তিন নিয়ে শান্তিপুর

শান্তিপুরের বিশ্বজোড়া খ্যাতির অন্যতম প্রধানস্তম্ভ এখানকার তন্তুবায় সমাজ। তাঁত শিল্পীদের হাতে তৈরী কাপড় চৈতন্যদেবের সময়েও বিখ্যাত ছিল। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈতাচার্যের কাছে এলে শান্তিপুরের 'যত তন্তুবায়গণ' তাঁর কাছে যান। ইংরেজরা এদেশে এসে কাপড়ের ব্যবসার জন্য যে কুঠি স্থাপন করেছিল তার কারণও ঐ শান্তিপুরের কাপড়ের খ্যাতি। শুধু ব্যবসা স্থাপনই নয়, তাতে তারা যে বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে তা বিস্ময়কর। পলাশীর যুদ্ধের বছরে অর্থৎ ১৭৫৭ সালেই এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৬৮,০০ টাকা। এর থেকেই শান্তিপুরের তাঁতীদের গুরুত্ব বোঝা যায়।

গোস্বামীরাই শান্তিপুরের প্রাণস্বরূপ। তাঁদের ভক্তি, শিক্ষা, জ্ঞান ও উন্নততর জীবনধারা শান্তিপুর তথা সমগ্র পূর্বভারতকে এদেশের সামাজিক ইতিহাসে বিশিষ্টতা দান করে। গোস্বামীদের আদিপুরুষ অদ্বৈতাচার্যের ভক্তি ও প্রেমধারা

সমগ্র দেশকে আপ্লুত করে। তাঁরই আহ্বানে ও প্রচেষ্টায় পৃথিবীর মুক্তিদাতা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। বিজয়কৃষ্ণ এই গোস্বামী পরিবারেরই সন্তান। শান্তিপুরের খ্যাতির অন্যতম প্রধান হলেন গোস্বামীরা।

শান্তিপুরের খ্যাতির অপর বৈশিষ্ট্য হল গুড়শিল্প। ভুর অর্থে ঝুরঝুরে গুড়কেই বলা হয়েছে। এখানকার গুড়শিল্প অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার গুড় থেকে তৈরী চিনি একসময়ে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করে ইউরোপের চায়ের টেবিলে অবশ্য ব্যবহার্য ছিল। 'দোলো' চিনি নামক এই চিনির ব্যবসা এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে ইংরেজরা আর্থিক কারণে এই ব্যবসায়ে নিজেদের নিয়োজিত করে। শান্তিপুরের চিনির কারখানাগুলি থেকে ১৭৯২ সালে বিলাতে ১৪০০ মণ চিনি রপ্তানী করা হয়। শান্তিপুরের কুঠিতে ইংরেজরা ঐ সালে শুধু চিনি শিল্পে নিয়োগ করে ২০,৫২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই। ১৮৪৬ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় যে শান্তিপুরের চিনিকলগুলিতে প্রতিদিন ৫০০ মণ চিনি তৈরী হত। গুড় থেকে চিনি তৈরী করতে যে গাদ বা বর্জ্য পদার্থ তৈরী হত তা' থেকে মদ তৈরী হত। শান্তিপুরে ইংরেজরা এইজন্য বিশাল মদের ভাঁটি তৈরী করে। এই মদের ভাঁটিটি ইংরেজদের কাছে এতই লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ১৭৯৬ সালেই এখানকার মদের ভাঁটির তত্ত্বাবধায়ক কার্ডিয়ানের মাইনে তারা বাড়িয়ে করে দেয় মাসিক ৫০০ টাকা।

এইসব কারণে শান্তিপুরের বিশিষ্টতা বোঝাতে এই প্রবাদবাক্যটির উৎপত্তি।

(৩) উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

এর দ্বারা বিভিন্ন এলাকার মেয়েদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। শান্তিপুরের মেয়েরা তাঁদের বাগবৈদগ্ধ্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁদের এই সুনিপুণ বাক্য দ্বারাও কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম না হলে তাঁরা হাতের ভঙ্গিতে সেই বিষয়টি বোঝান। শান্তিপুরের মেয়েদের এই স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা থেকে প্রবাদবাক্যটির সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) নিমাই মোড়ল-না হইলে শান্তিপুর আঁধ

শান্তিপুর নাথ শ্রীশ্রী অদ্বৈতচার্যকে বর্তমান বৈষ্ণব প্রেমধারার প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর প্রজ্ঞা ও ভক্তিই বাংলায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মনোবৃত্তি তৈরী করে। প্রেমঘন চৈতন্যদেবকে তিনিই পৃথিবীতে আনয়ন করেন। চৈতন্যদেবের মাধ্যমেই তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনের সংকল্পকে রূপ দেন; নিমাইকে সত্যকারের চৈতন্যে

রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তিনিই আবার চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্যের এত গুণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের খ্যাতির সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। চৈতন্যদেব সৃষ্টি না হলে শান্তিপুরনাথের এই বিরাটত্ব অজ্ঞাতই থেকে যেত—সেই বিষয়টি বোঝাতেই এই প্রবাদবাক্যটি।

## (৫) শান্তিপুরের লৌকিকতা

শান্তিপুরবাসী অত্যন্ত অতিথি বৎসল। তারা বহিরাগতদের স্বগৃহে যথাযথভাবে সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। শান্তিপুরবাসীর অতিথিপরায়ণতা যে কতখানি তার প্রমাণ পাওয়া যায় কলকাতার জীবশিব মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবচন্দ্র লাহিড়ি এল. এম. এস., এম. আর. এস. আই (লণ্ডন) এর একটি লেখায়। তিনি ফরিদপুরের লোক এবং কলকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ছিলেন। তিনি লিখছেন :

"তেরশ আটাশ সালে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন কালে,
উপনীত গগণ ভবন
পথিক কৃষ্ণান্বেষণে দেবেন্দ্র মোদক সনে
শান্তিপুরে প্রথম গমন।
গগণের তাঁত ঘরে মাটি পাটি শয্যোপরে
সেবা তৃপ্তি মায়ের কৃপায়
অপরাহ্নে বাণীকণ্ঠ ধর্মশাস্ত্রে কলকণ্ঠ
চিতে স্মৃতি সদাই জাগায়॥"

শান্তিপুরবাসীর এই আতিথেয়তা আগন্তুকের বিদায়ক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এর থেকেই 'গাড়ীতে উঠিয়ে' বা 'নৌকা ঠেলে দিয়ে' থাকতে বলা বাক্যটির উৎপত্তি।

## (৬) শান্তিপুরের তেঁদড়, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর

বাংলার প্রথম বারোয়ারী পূজা হয় শান্তিপুরে। শান্তিপুরের অধিবাসীরা আশিহাত পরিমাণ এক বিশাল দুর্গাপ্রতিমা গঙ্গার ধারে নির্মাণ করে প্রায় একমাস ধরে এই পূজা পরিচালনা করেন। এর জন্য সর্বসাধারণের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়নির্বাহ করা হয়। একমাস পরে ঐ প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেটে টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে নিমজ্জিত করা হয়। এরই প্রতিবাদে কয়েকদিন পরে গুপ্তিপাড়ার অধিবাসীরা একটি বিশাল গণেশ মূর্তি তৈরী

করে তার গায়ে অশৌচের বস্ত্রাদি পরিয়ে শান্তিপুর শহর প্রদক্ষিণ করায়। সেই গণেশের গায়ে লেখা ছিল 'কয়েকদিন পূর্বে আমার মাতৃদেবী (দুর্গা) শান্তিপুরে গঙ্গার ধারে আততায়ীর হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন। তাই আমার মাতৃশ্রাদ্ধে শান্তিপুরবাসীর গুপ্তিপাড়ায় নিমন্ত্রণ।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঐ সময়ে শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়ার সঙ্গে রেষারেষি চলত। সাধারণ বঙ্গসমাজ কিন্তু শান্তিপুরবাসীর এই প্রতিমা বিসর্জনের কাজকে সমর্থন করেনি। অপরদিকে ১৭৯০ সালে কৃষ্ণনগরের মহারাজা ঈশানচন্দ্র রায় তৎকালীন একলক্ষ টাকা খরচ করে একটি বানর ও বানরীর বিয়ে দেন। এই উপলক্ষে নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, উলা বা বীরনগর এবং শান্তিপুর থেকে পণ্ডিতমণ্ডলী আমন্ত্রিত হন। এই বানর ও বানরী গুপ্তিপাড়া থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এইসব ঘটনার স্মরণে বর্তমান প্রবাদবাক্যটির উৎপত্তি।

## শান্তিপুরের প্রবাদ

### (১) আড়ঙ্ ধোলাই

কোন বেয়াড়া ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা ভদ্রস্থ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শান্তিপুরে কমার্শিয়াল রেসিডেন্সি বা বাণিজ্যিক কুঠি খুলে শান্তিপুরের বিখ্যাত কাপড় নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে। এই কুঠির অধীনে মোট এগারোটি বস্ত্র সংগ্রহ কেন্দ্র ছিল। এগুলির নাম ছিল আড়ঙ্। আড়ঙ্-এ জমা দেওয়ার আগে কাপড়গুলি উত্তমরূপে কাচা হত। তাঁতের নতুন কাপড়কে গোবর, সাজি মাটি ও ক্ষার মিশিয়ে ভালভাবে সিদ্ধ করার পর আছাড় দিয়ে ও মুগুরের সাহায্যে পিটিয়ে উপযুক্তরূপে ধোলাই করা হত যাতে ঐ কাপড় শাঁখের মত সাদা হয়। এর নাম ছিল শাঁখ পেটাই কাপড়। শান্তিপুরের তাঁতের কাপড় ধোলাই এত ভাল ছিল যে, অন্যান্য কুঠি থেকেও এখানে কাচার জন্য কাপড় আসত।

এরকম ধোলাই থেকে প্রবাদ বাক্যটির উৎপত্তি।

### (২) রাস—রাস গেলেই ফাস, বসে থাকো তিনমাস

একটি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ও পরের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ হওয়ার মধ্যবর্তী বিরাট ব্যবধানের উদ্দেশ্যে খেদোক্তি।

শান্তিপুরে বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্যে রাস পার্বন সর্বশ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর শান্তিপুরে রাস আসে। এর জন্য সমগ্র শান্তিপুরবাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। তারপর ভাঙ্গারাসের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবপ্রিয় শান্তিপুর বাসীর মন হয়ে যায়

বিমর্ষ। তারা অপেক্ষা করে পরবর্তী বড় উৎসব সরস্বতীপূজার জন্য। মধ্যবর্তী দীর্ঘ তিনমাস সময় উৎসবহীন। তার থেকেই এই প্রবাদের উৎপত্তি।

## (৩) রেসো মাল

পচা, অব্যবহার্য বস্তু।

শান্তিপুরের রাসের মেলায় দেশ দেশান্তর থেকে নানা দোকানদার নানা জিনিস নিয়ে আসে। এদের অনেকাংশই নিকৃষ্ট মানের। শান্তিপুরবাসী এসব জিনিস-পত্রের প্রতি অনাসক্তি দেখায় এবং ঐ জাতীয় জিনিস ব্যবহারে অপরকে অনুৎসাহিত করে। তাই এই তুচ্ছার্থক প্রবাদ-বাক্যটি প্রচলিত হয়েছে।

## (৪) রাঙের রাধা / রাইরাজা

কর্মবিমুখ, আত্মচিন্তায় মগ্ন অনূঢ়া কন্যা বা কিশোরীবধূর প্রতি শ্লেষাত্মক উক্তি।

শান্তিপুরের দেবালয়সমূহে অর্চিতা রাধামূর্তিগুলির অধিকাংশই অষ্টধাতুর। সাধারণ লোকে একে রাং-এর তৈরী বলে। এদের রূপলাবণ্য ও শিল্প সুষমা অবর্ণনীয়। অনুরূপভাবে ভাঙারাসের মিছিলে যে বালিকাকে রাইরাজা সাজিয়ে বের করা হয় তাও সার্বিক সুষমামণ্ডিত। কিন্তু কি অষ্টধাতুর রাধা বা জীবন্ত কন্যা রাইরাজা উভয়ই অনড়, অচল। মনে হয় তারা সর্বদা আত্মস্থ। কোনো কাজ কর্ম বা নড়াচড়া তারা করে না। এই কারণে এই প্রবাদবাক্যটি সৃষ্টি হয়েছে।

## (৫) গোপালপুরের হাঁড়ি—চৌগাছার সরা

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বভাবগত মিল অর্থে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

শান্তিপুরের গোপালপুর পল্লীর মাটির হাঁড়ি বিখ্যাত। এই হাঁড়ি যেমন টেকসই তেমনই সুন্দর। অপরদিকে চৌগাছা পল্লীতে প্রচুর কুমোরের বাস। এঁদের প্রধান কাজ মূর্তি তৈরী। তাছাড়া মাটির সরা, গ্লাস প্রভৃতিও এখান তৈরী হয়। এসব জিনিস খুবই শক্ত ও সুচারুরূপে নির্মিত। মাটির হাঁড়ির মুখের সরা এখান থেকেই সংগৃহীত হয়।

হাঁড়ি ও সরার ঐক্য থেকে প্রবাদ বাক্যটি উৎপন্ন হয়েছে।

## (৬) মা যেন আগমেশ্বরী / মহিষখাগী

ভীষণদর্শনা, উগ্রচণ্ডা মহিলা বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

শান্তিপুরের আগমেশ্বরী ও মহিষখাগী—দুইটিই বিখ্যাত কালীমাতা। এঁদের

মূর্তি যেমন বৃহদাকার তেমনি ভীষণদর্শনা। লোলজিহ্ব এই বিশাল মূর্তি দুটি অনেক সময়েই ভয়ের উদ্রেক করে।

এই মূর্তিদ্বয় থেকেই বর্তমান প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে।

## (৭) বেটা যেন মতিরায়ের নাতি

উচ্ছৃঙ্খল, বেয়াড়া ও অশালীন যুবক অর্থে ব্যবহৃত।

মতিরায় শান্তিপুরের একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। ইনি একাধারে দোর্দণ্ড প্রতাপ, সাহসী এবং বীর ছিলেন। অপরদিকে মদ্যপ, উচ্ছৃংখল ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। তাঁর পৌত্রের চরিত্র তাঁর আদলে গঠিত হবে এইটিই স্বাভাবিক।

এই জন্যই এই প্রবাদ।

## (৮) দুইদিকে দুই কলাগাছ-মধ্যখানে শ্যামচাঁদ

সুসজ্জিত আসরে পরিজন পরিবেষ্টিত মূল নায়ক।

শান্তিপুরের অসংখ্য দেবদেবী মূর্তির মধ্যে শ্যামচাঁদ বিগ্রহ অপূর্ব সুষমাসমন্বিত। এই দৃষ্টিনন্দন মূর্তিটি যখন বালকবেশে বা রাজবেশে উভয়দিকে কলাগাছ দ্বারা শোভিত হয়ে অথবা চামর-ব্যজনরত সখীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করেন সে দৃশ্য অতি মনোরম।

এই দৃশ্য থেকে প্রবাদটির উৎপত্তি।

## (৯) গাজিম খাড়া

উদ্দেশ্যহীনভাবে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা অর্থে ব্যবহৃত।

শান্তিপুরের অন্যতম লোক উৎসব হল গাজি বা গাজিমের বিয়ে। এখানে প্রতি বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে মাঠের মধ্যে দুটি বাঁশকে মামা ও ভাগ্নে হিসাবে খাড়াভাবে পোঁতা হয়। বলা হয় এটি হ'ল গাজির বিয়ের আসর। সারাদিন উৎসবের পর ধাক্কাধাক্কিতে বাঁশ দুটি ঠেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের আসর ভেঙে যায়। পরের বছর আবার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। সারারাত্রি দিন-ব্যাপী বাঁশদের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে এই প্রবাদের সৃষ্টি।

## (১০) দূর হ' পশ্চিমে

গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল বা অন্য অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বস্তুকে দূর করবার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত।

এই প্রবাদটি একটি দুঃখজনক স্মৃতিও বেদনার্ত মানুষের আকুতি থেকে সৃষ্ট। কুখ্যাত বর্গীরা নদীয়া তথা শান্তিপুর পর্যন্ত এসেছিল। তাদের অত্যাচার ছিল সীমাহীন। তারা বাংলার তথা শান্তিপুরের পশ্চিম দিক থেকে আসত। পশ্চিমাগত এই শত্রুদের সঙ্গে যে কোন ক্ষতিকারক ব্যক্তি বা বস্তুই শান্তিপুরের জনসাধারণের কাছে সমগোত্রীয়।

## অন্ধকারের দিনগুলি

ইংরেজরা যখন এদেশের শাসন ক্ষমতা পান তখন শান্তিপুরের জমিদার ছিলেন নদীয়ার জমিদার বা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মোগলযুগেই এঁদের পূর্বপুরুষ জমিদারী পান। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে তাঁরা নবাবের কাছ থেকে জমিদারী পেতেন। জমিদার আবার রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা রায়তদের ওপর যথেচ্ছ পরিমাণ খাজনা আদায় করতে পারতেন না। এর জন্য নির্দিষ্ট হিসাব ছিল। একে বলা হত 'নিরিখ'। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের কোন একদিনে প্রতিবৎসর নবাব সমস্ত জমিদারদের ডেকে এই খাজনা ঠিক করে দিতেন। একে বলা হত 'পুণ্যাহ'। জমিদার রায়তদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত কোন খাজনা আদায় করতে পারতেন না।

ওয়ারেন হেসটিংস্ গভর্নর হওয়ার পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে স্থির করলেন যে, অতঃপর জমিদারদের কাছে পাঁচ বছর মেয়াদে জমিদারী দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি সার্কিট কমিটি গঠন করেন। তাঁরা নদীয়াকে আদর্শস্থান হিসাবে বেছে নিয়ে প্রথমেই কৃষ্ণনগরে এলেন। ১৭৭২ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে পাঁচ বছরের জন্য এই জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও হল যে, অতঃপর জমিদার আর 'নিরিখ' নির্দিষ্ট কর ভিন্ন অতিরিক্ত কোন কর রায়ত বা চাষীর কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না। হেসটিংসের সার্কিট কমিটি জুনমাসে কৃষ্ণনগরে এলেন। এর আগেই নদীয়ার ইংরেজ কালেক্টর জ্যাকব রাইডার এই জেলার ৫০টি পরগণার খাজনার তালিকা, তাদের পূর্বাপর ইতিহাস, নিষ্কর জমির তালিকা এবং আদায়বাবদ ব্যয়ের পূর্ণ খবরাখবর সমস্ত কিছু সংগ্রহ করে রাখেন। ঐ সার্কিট কমিটিতে ওয়ারেন হেসটিংস স্বয়ং ছিলেন। জরীপের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে তিনি জমিদারদের নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেসব বে-আইনী শুল্ক বা কর আদায় করেন তা যেন অবিলম্বে বন্ধ করেন। পরবর্তীকালে জমিদারী সাত বৎসর ও দশ বৎসরের মেয়াদে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৭৯৩ সালে পাঁচসালা, সাতসালা ও দশসালা ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলেন। ফলে জমিদারী ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এল। প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন করে জমিদাররা যেভাবে কর আদায় করতে আরম্ভ করলেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই দেশের অভিজাত জমিদারদের বদলে এক-দল ধূর্ত, সুযোগসন্ধানী ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যবসায়ী তথা বেনিয়ান মুৎসুদ্দীর দল তাদের অর্থ জমিদারী ক্রয়ে নিয়োগ করতে লাগল। এঁরা সকলরকম নিয়মনীতির

বাইরে ওপরের কর্মকর্তাদের উৎকোচ ও লোভের সাহায্যে বশ করে রায়তদের ওপর সীমাহীন শোষণ চালাতে থাকেন। জমিদারীতে অর্থ বিনিয়োগ করলেও প্রজাস্বার্থ বা জমিদারী নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার মত মানসিকতা এঁদের ছিলনা। তাদের অর্থের জোরে তারা নবপ্রতিষ্ঠিত আদালতগুলিকে নীরব করে দেয়। এইসব নব্য জমিদারেরা জমিদারী অন্যজনকে ইজারা দিত। এইভাবে জমিদারদের পরবর্তীস্তরে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি অসংখ্য ছোট ছোট জমিদার সৃষ্টি হয়। শান্তিপুরেও এই মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার প্রচুর ছিলেন। তাঁদের অত্যাচারে শন্তিপুরের রায়তদের অবস্থা কিরকম হয়েছিল তার একটি বিবরণ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে নদীয়ার অফিসিয়েটিং কালেক্টর সি. আর. স্টিভেন কলকাতার বোর্ড অব্ রেভিনিউকে পাঠান। এর থেকে দেখা যাবে কি ভীষণরকম অর্থনৈতিক শোষণ শান্তিপুরের সাধারণ অধিবাসীর ওপর এখানকার ক্ষুদে ক্ষুদে তথাকথিত 'জমিদাররা' চালাতেন।

শান্তিপুরে আদায়ীকৃত কয়েকটি বে-আইনী কর :

ফৌজদারী : জেলায় পুলিশ বা থানাদার রাখা বাবদ যে ব্যয় হত সেই কারণে আদায়ীকৃত কর। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ রেগুলেশনে এবং ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ রেগুলেশনে জেলায় শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ রাখার দায়িত্ব জমিদারদের ওপর বর্তায়।

ডাক খরচা : ডাকব্যবস্থা রাখার জন্য যে খরচ তা আদায় করার জন্য দেয় কর। আইন অনুসারে লর্ড মিন্টো কর্তৃক প্রবর্তিত ডাকহরকরার জন্য দেয় কর।

বাটা : নবাবী টাকা থেকে কোম্পানীর টাকায় পরিবর্তনের জন্য আদায়ীকৃত কর।

ছুট্ : রায়তদের গাছপালা বা গাছের পাতা বিক্রির ক্ষেত্রে জমিদারগণ কর্তৃক বে-আইনীভাবে আদায়ীকৃত বিক্রয় মূল্যের এক-চতুর্থ অংশ।

কয়ালী : গ্রামের শস্যাদি বিক্রয় ও মাপার সময়ে শস্যের মূল্য বা ওজনের ওপর দেয় কর।

জন্মযাত্রা ও রাসযাত্রা : জমিদারের বাড়ীর জন্মাষ্টমী ও রাসযাত্রা উৎসবের জন্য প্রজার কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর।

পূজা পার্বনী : জমিদার ও তাঁর গোমস্তার বাড়ীর কার্তিক পূজার জন্য রায়তদের কাছ থেকে আদায় করা কর।

বান সেলামী : গুড় জাল দেওয়ার জায়গার ( বান ) জন্য জমিদারকে দেয় কর।

ঘানি থাস্তা জমা : তেল তৈরীর ঘানি গাছের জন্য তৈলিক ( কলু ) এর উপর ধার্য কর।

ইজারদারী : রায়ত জমিদারের কাজ থেকে জমি ইজারা নেওয়ার সময়ে ধার্য করের অতিরিক্ত আদায়।

দাখিলা খরচা : ইজারা নেওয়া জমির দখল সংক্রান্ত কাগজপত্র নেওয়ার সময়ে রায়তদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর।

ছাপা রসিদ খরচা : মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রদত্ত ন্যায্য করের জন্য জমিদাররা ছাপানো রসিদ দিতেন। সেই রসিদ ছাপানোর খরচ হিসাবে আদায়ীকৃত কর।

আগমোর নজর : জমিদার কোনো গ্রামে এলে তাঁর সম্মানে প্রজাদের দেয় কর।

বিবাহ খরচা : রায়তের ছেলের বিয়ে হলে এক টাকা থেকে চারটাকা পর্যন্ত ও মেয়ের বিয়ে হলে আট আনা থেকে দু'টাকা পর্যন্ত কর জমিদার আদায় করতেন।

ভিটা সেলামী : রায়তের বাড়ীতে পূজা বা উৎসব হলে জমিদারকে দেয় কর।

কীর্তি ভিক্ষা : জমিদারের পিতা বা মাতার মৃত্যু হলে তাঁর জাঁকজমকসহ শ্রাদ্ধ কার্যের জন্য প্রজার দেয় কর।

যৌতুক : জমিদারের বাড়ীতে অন্নপ্রাশন বা বিয়ে হলে প্রজাদের দেয় কর।

জরিমানা : বিবাদমান দুই রায়তের বিবাদ মিটিয়ে দিলে জমিদারকে দেয় কর।

বদমায়েশী জরিমানা : প্রজা কোন গর্হিত কাজ বা ছোটখাট ফৌজদারী অপরাধ করলে তা মিটিয়ে দিলে দুই বিবাদমান পক্ষ কর্তৃক জমিদারকে দেয় কর।

আমচুষ্‌নি : জমিদারের আমবাগানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রজাদের দেয় কর।

পুলিশ খরচা : কোন অস্বাভাবিক বা হঠাৎ মৃত্যুর তদন্তের জন্য গ্রামে পুলিশ এলে তার খরচ বাবদ রায়তদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর।

পেয়াদা খরচা : জমিদারের খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত গ্রামের গোমস্তাকে খবর দেওয়ার জন্য জমিদার কর্তৃক রক্ষিত পেয়াদার জন্য দেয় কর।

হুজুর খরচা : জমিদারের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য সদরে নিযুক্ত আমলাকে জমিদারের দেয় অর্থ প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায়।

বাজন হাঁকা : জমিদারের বা গোমস্তার ছেলেমেয়ের উৎসব-আতিশয্য পূর্ণ বিয়ের ক্ষেত্রে প্রজাদের দেয় কর।

ভিক্ষা পার্বনী : যে কোন কারণে জমিদারের হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হলে তা মেটাবার জন্য রায়তদের দেয় কর।

দাই মহল : দাই বা ধাত্রীর কাজ করার জন্য দাইদের কাছ থেকে জমিদারদের আদায়ীকৃত কর।

এসব ছাড়াও পুণ্যাহ খরচা ( জমিদার কর্তৃক অনুষ্ঠিত পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের খরচ), হলভঞ্জন ( প্রথম হলকর্ষণের পর আদায়ীকৃত কর ) প্রভৃতি নানারকম বে-আইনী কর আদায় করা হত।

নির্দিষ্ট পরিমাণ ও আইনসম্মত করের অতিরিক্ত এসব বে-আইনী কর না দিতে পারলে প্রজাদের ওপর যেসব অমানুষিক অত্যাচার চালানো হ'ত তার কয়েকটির বিবরণ পাওয়া যায় সেকালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। এগুলি হল :

(১) দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত, (২) 'চর্মপাদুকা প্রহার', (৩) 'বংশ কাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থলদলন', (৪) 'খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকামর্দন' (৫) ভূমিতে 'নাসিকাঘর্ষণ', (৬) পিঠে দু'হাত মোড়া দিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে পাক দেওয়া, (৭) গায়ে বিছুটি দেওয়া, (৮) হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, (৯) কান ধরে 'দৌড় করানো', (১০) 'কাঁটা' দিয়ে 'হস্তদলন'। দুখানা কাঠের বাখারির একদিক বেঁধে তার মধ্যে হাত রেখে মর্দন করা। এই যন্ত্রটির নাম 'কাঁটা'। (১১) গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদে ইঁটের ওপর পা ফাঁক করে দু'হাতে ইঁট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, (১২) প্রবল শীতের সময়ে জলে চোবানো, (১৩) 'গোনীবন্ধ' করে জলমগ্ন করা, (১৪) গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান দেওয়া, (১৫) ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা, (১৬) চুণের ঘরে বন্ধ করে রাখা, (১৭) কারারুদ্ধ করে উপবাসী করে রাখা, (১৮) ঘরের মধ্যে বন্ধ করে লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া দেওয়া ইত্যাদি।

শান্তিপুরের তথাকথিত জমিদাররা উপরোক্ত সবরকম অত্যাচারই চালাতেন। প্রখ্যাত সাধু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন বালক তখন একদিন দেখেন জমিদার মতি রায়ের বাড়ীতে একজন রায়তকে নিয়ে গিয়ে জমিদারের নির্দেশে 'বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা তার বক্ষঃস্থল দলন' হচ্ছে। তিনি জোর করে ঐ রায়তকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন।

# বাহির-বিশ্বে শান্তিপুর

শান্তিপুরের বহু সন্তানই বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতিও পেয়েছেন অনেকে। আবার অনেকে বাহির-বিশ্বে স্থায়ী কিছু সম্পদ রেখে গেছেন যার স্মৃতি সর্বদাই শান্তিপুরকে মনে করিয়ে দেবে।

এইরকম এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তি ছিলেন স্যার অতুলপ্রসাদ চ্যাটার্জী। অতুলপ্রসাদের জন্ম শান্তিপুরে ১৮৭৪ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে। শান্তিপুরেই পড়াশোনা আরম্ভ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে লণ্ডন যান। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কিংস কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। এডিনবরার আইন কলেজ থেকে সেখানকার সর্বোচ্চ ডিগ্রি এল. এল. ডি অর্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৮৯৬ সালে আই. সি. এস্ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় এই স্থান দখল করতে পারেননি। ১৮৯৬ সালেই তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাউনসর পদক লাভ করেন। ঐ বৎসরই তিনি ভারতে ফিরে এসে উত্তরপ্রদেশে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর জীবনের সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় ও কর্মমুখর সময় হল ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ে তিনি ব্রিটেনে ভারতীয় হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। এ ভিন্ন তিনি ওয়াশিংটনে ও জেনেভায় লীগ অব্ নেশনস্-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সভাপতি সহ বিভিন্ন পদ, জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য ও পুনর্গঠন সংস্থায় ভারতীয় দলের নেতৃত্ব, রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টস্-এর সভাপতি প্রভৃতি পদ অলংকৃত করেন।

তিনি লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার থাকার সময়ে লণ্ডনে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ ও কাজকর্ম চালানোর জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস' নির্মাণ করান। ১৯৩০ সালের ৮ই জুলাই এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন ব্রিটেনের রাজা সম্রাট পঞ্চম জর্জ। সম্রাট এই 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করার জন্য অতুলপ্রসাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর নির্মাণ বৈশিষ্ট্য, আভ্যন্তরীন অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি সব-কিছুই অতুলপ্রসাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়। ১৯৫৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডেই তিনি মারা যান।

আর একজন আন্তর্জাতিক শান্তিপুরবাসী ছিলেন স্যার আজিজুল হক। ইনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুরেই তিনি শিক্ষারম্ভ করেন। কৃষ্ণনগর আদালতে ওকালতি করবার সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

ও পরে বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার স্পীকার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গঠিত তৎকালীন আইন পরিষদের প্রথম স্পীকার পদটি তিনিই অলংকৃত করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। এরপর তিনি লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। লণ্ডনে ইনিই শান্তিপুরের দ্বিতীয় অধিবাসী যিনি এই পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বহির্ভারতে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী এই দুই শান্তিপুরবাসী ভিন্ন অন্ততঃ অপর দুই শান্তিপুরবাসী ভারতের বাইরে তাঁদের স্থায়ী কীর্তি রেখে গিয়েছেন। প্রথমজন হলেন ব্যায়ামবীর ও যোগবিদ্যা পারদর্শী শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন শিকাগো ধর্মসভায় ভারতের অধ্যাত্মধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সেদিন পাশ্চাত্যের জনগণের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুন ধারণা জন্মায়। অপরদিকে স্বামীজির উদাত্ত আহ্বান 'আমি এমন মানুষ চাই যাদের পেশীসমূহ লৌহের মত দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তাদের মধ্যে থাকবে এমন একটা মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত' এদেশের যুবকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। শান্তিপুরের ব্যায়ামবিদ্ যোগাচার্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি প্রাণ। তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বামীজির পরবর্তী দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম বিদ্যাকে তুলে ধরেছিলেন। অবশ্য তাঁর বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন ভারতের যোগ-বিদ্যা। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর শান্তিপুরে তাঁর জন্ম। এখানকার বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হয়। বালক বয়সে অত্যন্ত কৃশকায় ও দুর্বল হলেও তিনি নিজ দক্ষতায় ক্রমশঃ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে যোগবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এ ব্যাপারে যোগবিদ্যাজ্ঞানী বালক-ভারতী তাঁকে খুবই সাহায্য করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি যোগব্যায়াম প্রদর্শন করেন এবং যোগবিষয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে এবং যোগব্যায়ামের প্রদর্শনী দেখে অনেক দেশীয় নৃপতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইভাবে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে তিনি এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রথম নেপাল যান এবং নেপালের রাজা তাঁর কাছে যোগের পাঠ গ্রহণ করেন। যোগব্যায়ামের প্রচারে আচার্য শ্যামসুন্দরের এই প্রথম বিদেশ যাত্রা। তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পিটস্‌বার্গ শহরে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক-নিরাময় কংগ্রেসের সভা বসে। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে নিরাময় ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রণালী প্রচারে শ্যামসুন্দরের অবদানের জন্য তাঁকে ঐ অধিবেশনে আহ্বান জানানো হয়। এইখানে তিনি ভারতীয় যোগবিদ্যা সম্পর্কে প্রচুর বক্তৃতা করেন। এখান থেকে তিনি নিউইয়র্কে যান। নিউইয়র্কের

বিশ্বমেলায় তাঁর যোগ প্রদর্শন স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এইখানে তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক ও গ্রন্থকার বানার ম্যাকফ্যাডেনের পরিচয় ঘটে। তিনি শ্যামসুন্দরকে এই ধরণের প্রাকৃতিক নিরাময় ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে তাঁর এই খ্যাতি প্রাচ্য জগতের তৎকালীন শিরোমণি জাপানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাপানের সম্রাট তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। যুযুৎসুর দেশ জাপানে তিনি অপর প্রাচ্য বিদ্যা যোগের প্রদর্শন করেন। এই সময়ে ইউরোপের 'দুর্বল মানুষ' হিসাবে পরিচিত তুরস্ক নতুনভাবে জেগে উঠেছিল। এই প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা সম্পর্কে তাঁরা খুব আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন এবং শ্যামসুন্দরকে তুরস্ক পরিভ্রমণে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে ওঠায় শ্যামসুন্দরকে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়। যুদ্ধাবসানে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'ভারতীয় শারীর শিক্ষা কংগ্রেস'।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে পৃথিবীর বৃহত্তম শরীর চর্চা সম্পর্কিত মেলা লিংগিয়াড্ বসে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য শান্তিপুরের দীনবন্ধু প্রামাণিককে নিয়ে উপস্থিত হন। এটি এক ধরণের দ্বিতীয় শরীর চর্চা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মেলা। সেখানে শ্যামসুন্দরকে অতি অল্প সময়মাত্র বলতে দেওয়া হয়। ঐ সময়ে বিশ্বের শরীর চর্চার আসরে ভারতের স্থান ছিল না বললেই চলে। সেই তুলনায় অপর ভারতীয় প্রতিনিধিদের 'মালখাম্বা' ব্যায়াম প্রদর্শনের জন্য অধিকতর সময় দেওয়া হয়। আচার্য শ্যামসুন্দর ঐ অল্প সময়েই যোগ সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা করেন। কিন্তু ঐ বক্তৃতা উপস্থিত জনমণ্ডলীর ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁরা শ্যামসুন্দরের জন্য আরও সময় দাবী করতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পরের একদিন তাঁর জন্য দীর্ঘতর সময়ের ব্যবস্থা করেন। ঐ বৎসরের ৯ই আগষ্ট তারিখে দি লিংগিয়াড ওয়ার্লড স্পোর্ট এগজিবিশনের পক্ষে মিঃ বার্টিল ক্যাস্টেলিয়াস্ শ্যামসুন্দরকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর কাছে ঐ বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে, 'প্রদর্শনীর দিন ( ৬ই জুলাই, ১৯৪৯ ) আপনার এবং আপনার শিষ্যের ( দীনবন্ধু প্রামাণিক ) যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনে আমরা অভিভূত। ঐ সময়ে উপস্থিত প্রায় আড়াই হাজার দর্শক অতি উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে আপনাদের ক্রীড়া কৌশল দর্শন করেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রশংসার কথা আমাদের জানিয়েছেন। ঐসব প্রদর্শনী ছিল এক একটি অভাবনীয় ক্রীড়াকৌশল।' স্টকহোমের ভারতীয় দূতাবাস ২৭শে জুলাই তারিখে তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়।

স্টকহোমে তাঁর অভাবনীয় সাফল্যের জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে ঐখানে একটি যোগশিক্ষার বিদ্যালয় খুলতে অনুরোধ জানান। ঐ বছরের ২৬শে সেপ্টেম্বর

তারিখের স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে, এস্কেলস্ত্রেকটস্ বেসকাও জিমনাসিয়ামে তিনি যোগের বিদ্যালয় খুলেছেন এবং অন্ততঃপক্ষে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিতভাবে শিক্ষা নিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে দু'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন কারোলিনস্কা হাসপাতালের ডাঃ আরনে নেলসন ও ডাঃ লিণ্ড। এঁরা শ্যামসুন্দরের প্রথম যোগ প্রদর্শনের সময়ে এর যাথার্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ডাক্তারী পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২৭শে অক্টোবর তারিখে বাইগনাডস্ফারেনিং-এর ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবরুমে পুনরায় তাঁদের একটি প্রদর্শনী হয়। এখানে সস্ত্রীক ভারতীয় দূত রতনকুমার নেহেরু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সহ মোট ১২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও আরও ২৫০ জন বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে শ্যামসুন্দর যোগ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং দীনবন্ধু প্রামাণিক তাঁর যোগব্যায়াম প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে ওখানে ভারতীয় নৃত্যের ওপর একটি চলচ্চিত্র দেখানো হয় এবং বিখ্যাত সুইডিস্ সঙ্গীতজ্ঞা মিসেস বার্জিতা বংক একটি গান গেয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি করেন। এইখানে ডাঃ বোর্জে ব্রিলিঅথ তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে, যোগ শব্দটির সঙ্গে ইংরেজ Yoke ও সুইডিস Ok কথাটির ( অর্থ যোগাযোগ বা মিলন ) শব্দের মিল আছে। এছাড়া সম অর্থে ল্যাটিনে Jugum ও জার্মানে Joch শব্দ দুটি পাওয়া যায়।

স্টকহোমের ষ্ট্র্যাণ্ডরাগস্ বোর্ডিং হাউসে সশিষ্য শ্যামসুন্দর বাস করতেন। যৌগিক প্রক্রিয়ার সময়ে সত্য সত্যই শরীরের ভেতরে কোনরকম প্রতিক্রিয়া হয় কিনা তা জানবার জন্য স্টকহোমের বিখ্যাত কারোলিনস্কা হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রচুর এক্সরে ফোটো তোলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা স্থিরনিশ্চয় হন। ২৫শে নভেম্বর তারিখে রাত্রি সাড়ে সাতটায় আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম হলে এ্যাংলো-সুইস সোসাইটির উদ্যোগে পরিপূর্ণ দর্শকের সামনে তিনি যোগ প্রদর্শন করেন। পরের দিন স্থানীয় সংবাদপত্রের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'গতকাল শুক্রবারের সন্ধ্যায় আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন কেন্দ্রে জায়গা না হওয়ায় বৃহত্তম লেকচার হলে যোগের বিষয়ে প্রোঃ গোস্বামী যে বক্তৃতা দেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রেকর্ড সংখ্যক শ্রোতা এসেছিলেন।'

ইতিমধ্যে সুইডেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে নতুন নতুন যোগকেন্দ্র খোলার জন্য চিঠি আসতে থাকে। ২রা ডিসেম্বরের স্থানীয় সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী জানা যায় যে, ফ্যালুন, ডালারানা প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা স্বয়ং এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরের বছর ৩রা মার্চ ( ১৯৫০ ) তারিখে নাকাতে স্থানীয় জারলা স্কুল-এর এ্যাসেম্বলী হলে তাঁদের অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ভারতীয় দূতাবাসের সেক্রেটারী মিঃ ইসার ও তাঁর স্ত্রী,

নাকার মেম্বর মার্টিন এ্যাণ্ডারসন, ভারততত্ত্ববিদ্ পল স্তাগুেগ্রেন উপস্থিত ছিলেন। ৫ই মার্চ রবিবারে তাঁরা এসকিলচুনাতে আবার প্রদর্শনী করেন। এখানে শ্যামসুন্দর যোগ-বিষয়ে ৮০ মিনিট ধরে বক্তৃতা দেন। সমবেত জনমণ্ডলী অধীর আগ্রহে তা শুনতে থাকেন। এর পরেই এখানে দীনবন্ধুর তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্র খোলা হয়।

শ্যামসুন্দরের সুইডেনে অবস্থান সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে কি ধরণের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল তা বোধ হয় আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ সেমিনারের সভাপতি মিঃ এস, বি, লিলজিগ্রেন-এর ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখের লেখা একটি চিঠি থেকে বোঝা যায় : 'মাননীয় শ্রী গোস্বামী, গতকাল আমি আপনার যোগবিষয়ে বক্তৃতা সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আমাদের এই হলে ইতিপূর্বে নোবেল পুরস্কার বিজেতা স্যার লরেন্স ব্র্যাগ, টি. এস. এলিয়ট, বারণ্ট্ বালচেন প্রমুখ অনেকেই বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই আপনার বক্তৃতা ছিল সকলের সেরা। আমাদের ইউনিভার্সিটির ঐটিই সবচেয়ে বড হল। ওখানে ২৮৫ জন লোক বসতে পারে। তার ওপর যতগুলো সম্ভব নতুন করে চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কমপক্ষে ৭৫জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্তক্ষণ এ দীর্ঘ বক্তৃতা শোনেন। ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমাদের চারটি ফ্যাকালটির যথা, অধ্যাত্মবিদ্যা, আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও মানবিক বিদ্যা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপকরাই শুধু ছিলেন না—আমি শ্রোতাদের মধ্যে দর্শনের অধ্যাপক ডঃ মার্ক-ওগায়ু, ধর্ম-ইতিহাসের ডঃ ওয়াইডেনগ্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রের ডঃ ব্যাকম্যান ( লুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ), রসায়নবিদ্যার ডঃ ওয়ালার প্রমুখকেও দেখেছি ………ঐ দিনটি ছিল আমাদের গর্বের ও আনন্দের।'

ঐ বছরের অক্টোবরে তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডে যান। সেখানে জুরিখে তাঁদের প্রদর্শনী হয়। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল থেরাপিউটিক ইনষ্টিট্যুট-এর ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য বিজ্ঞজনদের সামনে এই প্রদর্শনী হয়। তাঁরা অভিভূত হয়ে যান। এখান থেকে ভারতীয় দূতাবাসের আমন্ত্রণে তাঁরা প্যারিসে যান। ১৯৫০ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁরা প্যারিসের ল্যাবরেটরি অব্ দি একাডেমি অব্ মেডিসিনের আডিয়ার হলে ফরাসী অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের সম্মুখে তাঁদের প্রদর্শনী করেন। প্যারিসস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার মালিক সহ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির প্রতিনিধিই এখানে উপস্থিত ছিলেন। ঐখানে শ্যামসুন্দর আর একটি যোগ বিদ্যালয় খোলেন। সরবোঁ রিচেলু হলে ৩০শে নভেম্বর পুনরায় তাঁদের প্রদর্শনী হয়। সরবোঁতেই তাঁদের বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৫১ সালের ১১ই জানুয়ারী প্যারিসের কমিটি ফর আর্টিসটিক এ্যাকৃটিভিটিস অব্ দি এ্যাসোসিয়েশন অব্ দি ইউনেস্কো ষ্টাফ-এর ইউনেস্কো হাউসে পুনরায় যোগ প্রদর্শনী করেন। ইতিপূর্বে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার তাঁকে লণ্ডনে আহ্বান জানান। ১৯৫০—

এর ডিসেম্বরে প্যারিস থেকে তিনি লণ্ডনে যান এবং ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁর প্রদর্শনী করেন। রাষ্ট্রদূত কৃষ্ণমেনন স্বয়ং দর্শকদের কাছে এঁদের পরিচয় করিয়ে দেন। ইতিমধ্যে বারবার স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার দেশসমূহ, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন জায়গায় যোগব্যায়াম প্রদর্শন ও যৌগিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে তাঁর দিন কাটে। অবশেষে ষ্টকহোমের বিদ্যালয়েই তিনি স্থায়ী আসন গ্রহণ করেন। ঐখানেই ১৯৭৮-এর ১৩ই অক্টোবর চিরকুমার শ্যামসুন্দরের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

অপরজন হলেন চিত্রশিল্পী ললিতমোহন সেন। ১৮৯৮ সালে শান্তিপুরে তাঁর জন্ম। ভারতীয় চিত্রশিল্পকে যাঁরা ভারতের বাইরে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন ললিতমোহন ছিলেন তাঁদেরই একজন। শান্তিপুরে প্রথম শিক্ষা আরম্ভের পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাধারণ শিক্ষায় আর অগ্রসর না হয়ে লখনউ গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্র্যাফটস্-এ ভর্তি হন।

১৯২৩ সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনে রয়্যাল কলেজ অব্ আর্টস-এ ভর্তি হন। রয়্যাল কলেজে শিক্ষালাভ কালেই তাঁর আঁকা ছাবগুলির একটি প্রদর্শনী রয়্যাল একাডেমিতে হয়। তিনি কাঠ-খোদাই শিল্পেও বিশেষ শিক্ষালাভ করেন এবং লণ্ডনের বারলিংটন হাউসের প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবি ও খোদাই শিল্প প্রদর্শিত হয়। তাঁর খোদিত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দুটি মূর্তি লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তিনি বিজ্ঞাপন চিত্রেও সমান দক্ষ ছিলেন এবং তাঁর আঁকা একটি বড় দেওয়াল বিজ্ঞাপনের পোষ্টার ছবি ব্রিটিশ শিল্প ফেডারেশনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার লাভ করে।

১৯২৯ সালে তিনি যখন লখনউ-এ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের একটি শাখার অধ্যাপনা করছিলেন সেই সময়ে ভারত সরকার লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস অলংকরণ করবার জন্য ভারতীয় শিল্পীদের এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আর এক শান্তিপুরবাসী স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে এই ইণ্ডিয়া হাউস তৈরী হয়। ললিতমোহন ইণ্ডিয়া হাউসের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ১১ ফুট × ৪ ফুট আকারের ভগবান বুদ্ধের একখানা ছবি পাঠান। যে চার জন শিল্পী নির্বাচিত হন ললিতমোহন সেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর। তিনি অন্য তিন শিল্পীর সঙ্গে ১৯২৯ সালের ২৪শে আগষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস অলংকরণের জন্য রওয়ানা হয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর বিলেতে পৌছান।

লণ্ডনে আসার পরেই ২৫শে সেপ্টেম্বর তিনি চিত্রাঙ্কন অনুশীলনের জন্য রয়্যাল কলেজে ভর্তি হন। এই অনুশীলনের সময়েই সম্রাট পঞ্চম জর্জের মহিষী মহারাণী মেরী ঐ কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হন এবং ললিতমোহনের আঁকা 'কুম্ভকার

বালিকা' ছবিটি তাঁকে এতই মুগ্ধ করে যে তিনি ঐটি রাজপরিবারের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কেনেন। রাণীর আমন্ত্রণে ললিতমোহন বাকিংহাম প্যালেসে (ইংলণ্ডের রাজারাণীর বাসগৃহ) যান। তাঁর আঁকা উপরোক্ত 'কুম্ভকার বালিকা' ও 'ক্রীতদাসী বালিকা' ছবি দুটি লণ্ডনের চিত্র শিল্প সম্পর্কীয় পত্রিকা 'স্কেচ'-এ রঙীন করে ছাপা হয়। ললিতমোহনের জলরঙে আঁকা 'পাহাড়ের রাণী' ছবিটিকে লণ্ডনের ফাইন আর্ট ট্রেড্ গিল্ড শিল্পীর স্বাক্ষর সহ একখানি রঙীন সংস্করণে মুদ্রণ করেন। রয়্যাল কলেজের পাঠ শেষ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ছ'মাস ধরে ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেন।

১৯৩১ সালের ৯ই এপ্রিল ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়াল-চিত্র আঁকার কাজ আরম্ভ হয় এবং দশ মাস পরে ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে এই কাজ শেষ হয়। ললিত-মোহনের প্রথম দায়িত্ব হয় ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরী হলের রিডিং রুমের গ্যালারীতে কোন ভারতীয় ঐতিহ্য বা প্রাচীন তথ্য তুলে ধরার। তিনি সেখানে অর্ধ-বৃত্তাকারে গৌতমবুদ্ধের একখানি ছবি আঁকেন। বেশ বড় মাপের ঐ ছবিতে দেখানো হয়েছে যে বুদ্ধদেব তাঁর নির্বাণের আগে তাঁর দায়িত্ব কাকে দিয়ে যাবেন সেই আলোচনা করছেন। সকলেই তাঁদের ভিক্ষাভাণ্ড হাতে তুলে ঐ দায়িত্ব গ্রহণের কথা জানাচ্ছেন। শুধু তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দ বুদ্ধের পদতলে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভুর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঐ ভবনের ওপরে যে বিশাল ডোম বা বৃত্তাকার গম্বুজ আছে তার ভিতরের দিকের দেওয়ালে ভারতীয় ইতিহাস ও জীবনধারার ছবি আঁকার ব্যবস্থা হয়। ঐ দেওয়ালের চারটি ভাগ ধরে এক একটি ভাগে ভারত ইতিহাসের গ্রীক, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগের চারটি ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত হয়। ললিতমোহনকে মুসলমান যুগের ছবিটি আঁকবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই গোলাকার গম্বুজের পূর্ব অংশে তিনি তাঁর ছবিটি আঁকেন। ঐ ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রিতে তাঁর নতুন রাজধানী নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর প্রস্তাবিত শহরের নকশা পরীক্ষা করছেন। গোলাকার বৃত্তের গায়ে এই ছবি আঁকতে তাঁকে ঘাড় উঁচু করে খুবই কষ্ট স্বীকার করে প্রায় দশ মাস ধরে একনাগাড়ে কাজ করতে হয়। পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন দৈনিক মাত্র একপাউণ্ড করে। এই দেওয়াল চিত্র আঁকবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও সস্ত্রীক শিল্পী রদেনষ্টাইন সহ ইণ্ডিয়া হাউস পরিদর্শন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উইলিয়াম রদেনষ্টাইন রয়্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ইণ্ডিয়া হাউসের কাজের জন্য লণ্ডন পৌঁছে ললিত মোহন প্রথম এঁর অধীনেই রয়্যাল কলেজে অনুশীলন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এইভাবে শান্তিপুরের শিল্পী ললিতমোহন

সেন তাঁর প্রতিভার পরিচয় ভারতের বাইরে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়ালে রেখে গিয়েছেন।

ছবির কাজ শেষ করেই ১৯৩২ সালের প্রথম দিকে তিনি ভারতে ফিরে এসে লখনউর চারু-কারু বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন এবং আমৃত্যু ঐ পদেই ছিলেন। অবসর পেলেই তিনি শান্তিপুর চলে আসতেন। চিরকুমার ললিতমোহন লখনউ-এ ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

# রসিক শান্তিপুর

প্রবাদ বাক্যে আছে : শান্তিপুর রসের সাগর।
এক এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥

অর্থাৎ শান্তিপুরের জন সাধারণ খুবই রসিক। প্রতি ঘরেই একাধিক রসিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

এটি নিছক প্রবাদ বাক্য মাত্র নয়। শান্তিপুরের প্রতি পাড়াতেই আগে একাধিক রসিক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যেত। এঁরা রসে, গানে, ছড়ায় এখানকার অধিবাসীদের জমিয়ে রাখতেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। কিন্তু মুখে মুখে কিংবা কোন ছেঁড়া কাগজে তাঁরা যেসব রসরচনা তৈরী করেছিলেন তা সর্বকালের, সর্বজনের। এসব রচনার অধিকাংশই আজ হারিয়ে গিয়েছে। রসিক ব্যক্তি এখনও অনেকেই আছেন। তবে জীবনযাত্রার জটিলতার ফলে এঁদের সংখ্যা গিয়েছে কমে।

এক সময়ে শান্তিপুরের খেউড় ও তুক্‌ক গানের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ভারত চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' খেউড় গানে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধির উল্লেখ দেখা যায়। খেউড় গানে শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা সামাজিক দোষ ত্রুটির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত থাকত না। নিছক কৌতুকের জন্যও এসব গান রচনা হত। আবার জীবন জিজ্ঞাসাও থাকত।

রাস্তায় নাচের মত নানা অঙ্গভঙ্গি করতে করতে চলতে চলতে এই গান গাওয়া হত। কিন্তু তা কোন সময়েই শালীনতা অতিক্রম করত না। রাসের সময়ে ও কালীপূজার রাত্রে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনও কোন কোন বারোয়ারী পূজা মণ্ডপে সাধাণতঃ দুর্গাপূজার নবমী রাত্রে খেউড় গান গাওয়া হয়। তবে এই সব খেউড় পূর্বের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে শঙ্কর দাস নামে একজন বৈষ্ণব মোহান্ত টোল খুলে গান শেখাতেন। তাঁর তৈরী গানের নাম ছিল 'তুক্‌ক'। তাঁর গান গুলির মধ্যে ছিল জীবন দর্শনের কথা—কিন্তু রসের ছলে। যেমন—

'ভবে আসা যাওয়া একক্কা / ধুমধাম যত কর সকলই ভাই ফক্কা। / চক্‌চকে চক্ চিকি চাকি, যার জোরে দিচ্ছ ধাক্কা। / নিঃশ্বাসে বিশ্বাস করোনা কখন পাবে অক্কা। / নয় দরজার মাঝে থাকো, খাও ষড়রিপুর ধাক্কা, / কখন কিযে ঘটবে রে ভাই সকলই জানো ফক্কা।' অথবা

'মন কেবল খাচ্ছ খাবি / কোথা যাবি / কিসে পাবি পথ ঠিকানা। / আচার্য কাকে বলে, কোথা চলে / কোন্ দেশেতে করে আস্তানা। / সেকি সহজে মেলে / লোক দেখালে / প্রাণ বিলালেও তা মেলেনা।' ইত্যাদি।

আর এক শ্রেণীর গান ছিল যা কোন ঘটনার সূত্রে রচিত হত এবং সুর দিয়ে তা গাওয়া হত। একে বলা হত 'নহর'। কবির গানে 'নহর' স্রষ্টা ছিলেন বিশ্বনাথ দাস। একবার পটেশ্বরী তলার পূজামণ্ডপে 'নহবৎ' বাঁধা হয়ে গেলেও বাজনার দল আসেনি। তাই সকলে ম্রিয়মাণ। এমন সময়ে বাজনদারেরা এসে যাওয়ায় ছেলের দল আনন্দে বাজি পোড়াতে লাগল। বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে ফেললেন—

'হাদিপাড়ায় এসেছে এক আল্‌পা কানা / সে যে গৌরীর নাতি / হাতে করে বাতি / বলে বোমায় আগুন দেনা।' ঐ এলাকার আগেকার নাম ছিল 'হাদিপাড়া।'

আবার ঠাকুরদাস নামে এক ব্যক্তি সজনে গাছের খুব যত্ন নিতেন। তাঁর সজনে গাছ প্রীতি বিশ্বনাথকে গান বাঁধতে উদ্বুদ্ধ করল :

"সজনে তলায় 'সন্ধ্যে' দিয়ে ঠাকুরদাস করেন দণ্ডপাত, জোড় করি হাত—

বলেন, 'তুমি আমার তরকারী, অসময়ের কাণ্ডারী,

তোমায় দিয়ে খেতে পারি এক পাথর ভাত।

কাজ কি আমার আম কাঁঠালে, তুমি থেকো কুশলে,

তোমায় পুঁতব সারি সারি, আর কোন গাছ পুঁতব না,

সজনে গাছ রে—

তোমার ফুলে মধু ঢালা, নাইকো তাহার তুলনা—

তোমার তলায় থাকলে শুয়ে অসুখ যে হয় কুপোকাত।"

আর একজন নহর-রচয়িতা ছিলেন জীবন সাহা। তাঁর নহরগুলি ছিল রসিকতায় পরিপূর্ণ। যেমন—

'বৌয়ের মত কে রাঁধতে পারে, / মশলা হলে ত' সবাই পারে। / শুধু তেলে নুনে ঝালে / হালুইকারের গোল্লা হারে, / মোচার ঝালে নেইকো লেখা / তোলা বিকায় টাকা টাকা / ন'টে শাক তায় তেলে শেঁকা / বুড়োয় খেলে যুবা করে।'

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ শান্তিপুর বড়বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হয়। প্রায় সমস্ত দোকানই পুড়ে যায়। অগ্নিদেবতা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে পর বৎসর থেকে বড়বাজারে ব্রহ্মাপূজা আরম্ভ হয়। চারদিন ব্যাপী পূজার আগের রাত্রে লৌকিক বিয়ের জলসাধার মত আয়োজন করা হয়। পুরুষরাই মেয়ে সেজে বের হন। সেই সঙ্গে ব্রহ্মার জলসাধার প্রধান আকর্ষণ ঢেঁকির ওপর দাড়ি মুখে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এক ব্যক্তি নারদ সেজে ছড়ার আকারে সকলকে বিয়ের নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণের ভাষাও হয় বিচিত্র। যেমন :

'এবার ব্রহ্মাপূজায় বিশাল আয়োজন / চাল এক বস্তা আর ঘি দশ মণ। / ভূত ভাতে পেত্নী পোড়া, / কেঁচোর অম্বল, জোঁকের বড়া,' / ইত্যাদি ইত্যাদি। এ

ভিন্ন দেশের বর্তমান অবস্থা ও সামাজিক বিষয় নিয়েও নানা রচনা থাকে। যথা :

"ওরে দাঁড়ারে ঢেঁকি দাঁড়া, তাড়াহুড়ো করিস্ নে তুই
হস্‌নে দিশাহারা।
বেতো রোগীর বুড়ো হাড়ে, তিনটি ভুবন ঘুরে ঘুরে,
বাবার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে হবে সারা।
তাই বলছি ছট্‌পটিয়ে, দৌড়াস্ নে তুই হট্‌হটিয়ে,
পড়লে একবার রাস্তার মাঝে নারদ যাবে মারা॥
বাজে কথা যাক্ এবার কাজের কথা শোনো,
শোনা ওগো মা জননী, পুরবাসী শোনো।
প্রতিবারের মতই এবার ব্রহ্মাপূজা হবে,
বাবার বিয়ে দেখতে ওগো তোমরা সবাই যাবে।
বারো ভূতের তেরো হাঁড়ি গবুরাজার দেশে,
মেরে কেটে সব কিছু ভাই যোগাড় হ'ল শেষে।
বাঁদর নাচ দেখেছ ভাই ? ভাল্লুক কেমন নাচে ?
উল্লুক নাচ দেখবে এবার দেশ নেতাদের মাঝে।
ল্যাং মেরে বেশ কায়দা করে কেমন ফেলা যায়,
রাতারাতি কেমন করে উজির হওয়া যায়।
সিধে নিতে ভোটে ছোটে, সবাই বলে বড়
যাত্রা পালা হবে এবার 'আমিই সবার বড়'।
কতকগুলো অপগণ্ড, দেশটা করলে লণ্ডভণ্ড,
গরীব মেরে লুটছে মজা কতকগুলো পাজি,
আড়াই মণি দুলিয়ে ভুঁড়ি, দেশের যত ধ্বজাধারী,
করছে কেমন গাড়ী বাড়ী দেখ হনুমান পাঁড়েজি।
যাত্রাগানের মাঝে সবই দেখতে পাবে ভাই,
কেবল চালের দাম কমবে কিনা সেই কথাটি নাই।
বাবার বিয়ের ভোজ খেয়ে সব ভুলবে নিজের নাম,
লক্ষ্মণ সে লছমন হোবে, লক্ষ্মী লছমী নাম।
এই বারেতে সাঙ্গ করি নিমন্ত্রণের পালা,
ওরে ঢেঁকি চালককে বল জোর কদমে চালা।
শান্তি হোক এই ভারতের, পুণ্য বাংলার মাটি,
শান্তিপুরের শান্তি হোক্, মানুষ হোক্ খাঁটি।
সৃষ্টি কর্তার আশীর্বাদে সুখে থাকো সবে,
প্রাণটি খুলে সবাই বলো আবার শান্তি হবে'॥

তরজা গানে শান্তিপুরের খুবই সুনাম ছিল। এরকম দুজন তরজা গায়কের নাম ভজহরি প্রামণিক ও হাজারী লাল দাস। দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন চালু হলে প্রাচীন রীতিনীতির ওপর আঘাত আসে। সে সময়ে অতি অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। হাজারী লাল গান বাঁধলেন :

'কালে কালে দেখব কত বল আর ;
গেলাম অবাক বনে দেখে শুনে কালের ব্যবহার-কদাচার।
হায়, মরে যাই একি কাণ্ড, লোকের ধর্মকর্ম হল পণ্ড,
হবে বিয়ে করে কারাদণ্ড, চণ্ডনীতি চমৎকার ॥
ছিল আট বছরে গৌরীদান, উঠে গেল সে বিধির বিধান,
জলে ফেলে দাও ভারত পুরাণ—সে সকল অতি অসার ॥
এখন গত হয়ে গেলে চোদ্দ, তারপরে বিয়ের বরাদ্দ,
নইলে হবে কনের বাপের আগুশ্রাদ্ধ—সগু সগু কারাগার।
বিয়ের আইন হল পাস, নিয়ম শুনে লাগে ত্রাস,
মেয়ের বাপের সর্বনাশ—বাহবা কলির কি বিচার ॥
ভাবে দীনহীন হাজারী দাসে, বাহবা আইন হল দেশে,
আরও কত হবে শেষে, বলতে পারে সাধ্য কার ॥'

শান্তিপুরের রসিকতার আর এক মুখ্য প্রকাশস্থল হল 'ময়ূরপঙ্খীর গান'। সাধারণতঃ রাসযাত্রার শোভাযাত্রার অঙ্গ হিসাবে এই ময়ূরপঙ্খী বের হয়। সাধারণ গরুর গাড়ীর ওপর বাঁশ ও কাগজ দিয়ে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত ময়ূরপঙ্খী নৌকার আদলে প্রস্তুত নৌকার ওপর চড়ে এই গান গাইতে গাইতে যায়। পুরুষেরা এবং মেয়ে সেজে পুরুষেরা একটি বিশেষ সুরে পৌরাণিক, সামাজিক. এমন কি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিষয় বস্তু নিয়ে এই গান করেন। আর গানের সুরের সঙ্গে মাত্রা হিসাবে 'আরে ঐ' বলে একবিশেষ অঙ্গভঙ্গী সহকারে এই গান গাওয়া হয়।

যেমন :— "আরে ঐ! ১৩৫৪ সালে ব্রিটিশ গেল দেশ ছেড়ে,
যারা হয়েছে স্বাধীন তাদের সুদিন দেশের গরীব গেল মরে।
আরে ঐ! মুটে মজুর তাঁতী কামার কৃষক যারা মাঠে চাষ করে
তারা দিনে রাত্রে মরছে খেটে যাচ্ছে অনাহারে।
আরে ঐ! বস্ত্র বিনে ঘরের কোণে, অনেক নারী কাঁদছে ঘরে পড়ে,
স্বামীরে বলে গামছা পরে কাপড় দাও ছেড়ে ॥" ইত্যাদি।

সেই সঙ্গে ব্রহ্মাপূজার সময়ে ব্রহ্মার বিয়ের জলসাধা আর একটি রসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এখানে ছেলেরা মেয়ের পোষাকে ও গহনায় সুসজ্জিত হয়ে কুলো, ডালা, আইসড়া ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্রহ্মাপূজার নিমন্ত্রণের ঢেঁকির সঙ্গে যায়।

শান্তিপুরের এইসব রসিকতার প্রাণ হল শান্তিপুরের অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত জনগণ। এতে শান্তিপুরের প্রাণের ছোঁয়া আছে। শান্তিপুরে আরও কিছু রসিক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা শিক্ষিত ও শহরমুখী। তাঁদের কথাবার্তায়, লেখায় নাগরিক রসিকতা লক্ষ করা যায়। এঁরাও রসিক কিন্তু শান্তিপুরের নয়—সারা বাংলার সাধারণ রসিকদেরই অংশ।

বেশ কিছুদিন আগে চৈতলপাড়া এলাকায় ভাইফোঁটা উপলক্ষে তরুণ ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে ভাইফোঁটার নানা উপকরণ হাতে নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো হত। তারা গান গাইতে গাইতে যেত, সঙ্গে থাকত ঢোল কাঁসি। তাদের গানের ভাষা ছিল :—

"চলগো দিদি ফোঁটা দিতে ভাই-এর কপালে।
চল চল রে মোরা যাই সকলে॥
চুয়া চন্দনের বাটী, আমন ধান দুর্বা দুটি,
হলুদ আর পান সুপারি নাও না বাটায় তুলে!
সন্দেশ আর কচুরি, মণ্ডা মিঠাই সারি সারি,
নিখুঁতি ও চন্দ্রপুলি দাও না দাদার হাতে তুলে॥"

আবার ফিরবার পথে তারাই গাইত—

"ফোঁটা দিয়ে ফিরলাম বাড়ী,
দাদা দিয়েছে হালফ্যাশানের শাড়ী
আমার দাদা আমার হল
ওদের মুখে কালি প'ল,
( তাই ) ভাবছে বসে বড়াই বুড়ি॥"

অবশ্যই গানগুলির রচয়িতা ছিলেন পূর্বোক্ত তরজাগায়ক হাজারী লাল দাস।

শান্তিপুরের অধিবাসীদের অনেক পরিবারেরই প্রকৃত পদবী ভিন্ন কিছু কিছু উপ-পদবী আছে। সেগুলির উৎপত্তি যে ভাবেই হোক না কেন এই উপ-পদবী বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। এগুলি থেকে রসিক শান্তিপুরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য শান্তিপুর যত শহর হচ্ছে ততই ঐ সব গ্রাম্য উপ-পদবী অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক্ এই উপ-পদবীগুলির একটি তালিকা তৈরী করেন এভাবে—

"এঁড়ে, ভেড়া, সিংহ, শেয়াল / বাঘ, ভাল্লুক, নকুলে, কয়াল।
হুমো, পাখি, পাঠি, পাঁঠা / কটা, হাঁড়া, কাষ্ঠ, ঠ্যাটা।
দড়ি, হরি, চিন্তা, কারা / সত্যি, ভুঁড়ে, কুমড়ো, বড়া।
বেড়, বাজিয়ে, বাজারে, ধনী / মুটকি, ঢেঁকি, পেঁয়াজে, পানি।
চুকলি, চক্র, মাকুন্দ, পেনো / বাগানে, ভাবরে, মগরা, দেনো!

ভবানী, মঠ, ভাগাড়ে, কেটে / কুঁজো, বোষ্টম, ট্যাংরা, মেটে।
পাটালি, পক্কান্ন, কলাই ডাল / ভেরেণ্ডা, মুকো, পুঁই, দালাল।
বঙ্গ, মণ্ডল, ধামার, চড়াই / চণ্ডী. মণ্ডা, তৈ, গড়াই।
খেয়াল, বোকা, কল্লা, হাপা / নাজির, ফৌজদার, পাঁচিল চাপা।
ভেসকো, পোড়া, হাইত, ভেড়ি / মুণ্ডমালা, ধন্বন্তরী।
ধুলো, পুলো, ভেলকি, গোরে / দপ্তরি, গড়, নপারি, ফোরে।
তাল, তাপাসি, ঘোড়াঘেটে / ভাট, পাটোয়া, ফ্যাঁচরা, গেটে।
টাঙ্গী, ভাঙ্গী, কাঁচকলা / পাড, পাউরুটি, ভেরো, হাবলা।
খুঁয়ো, বর্গী, হাঁ-করা / কাঠঠোক্‌রা, খোঁড়া, দাড়া।
পুতলো, পাতা খেগো, থৈ / একশ' ছয়ে হ'লো সই।
আর যত সব থাকলো পড়ে / এর পরেতে দেবো ধরে॥"

গ্রাম্য শান্তিপুরের এক গ্রাম্য রসিকতার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে তৎকালীন গ্রাম্য প্রতিশোধস্পৃহাও রয়েছে। এখানকার দুই ধনী পরিবারের পাশাপাশি জমির সীমানার ওপর অবস্থিত একটি গাছ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। অবশেষে দ্বিতীয় পরিবার আদালতে জিতে ঐ গাছের দখল পায়। তাঁরা ঐ গাছটি কেটে বাজনা বাজিয়ে পতাকা দিয়ে সাজিয়ে সারা শান্তিপুর ঘুরে অপর পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁদের জয় ঘোষণা করেন। এরপর প্রথম পক্ষ উচ্চতর আদালতে এর বিরুদ্ধে আপীল করেন। গাছটি যে তাঁদেরই এই প্রমাণের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপককে দিয়ে গাছের শিকড় কোন্ দিকে ছিল তাও পরীক্ষা করান। অধ্যাপকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উচ্চতর আদালত ঐ গাছটি তাঁদের বলে ঘোষণা করেন। ততদিনে ঐ গাছটি শুকিয়ে একখণ্ড কাঠে মাত্র পরিণত হয়েছে। তাঁরা ঐ কাঠটিকে মালা দিয়ে সাজিয়ে গরুর গাড়ী করে বাজনা বাজিয়ে আবার শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে তাঁদের জয় ঘোষণা করান। অবশ্য এ ধরণের স্থূল রসিকতা পুরানো বাবু সমাজের অনুকরণ মাত্র। প্রসঙ্গতঃ কলকাতার চূড়ামণি দত্তের ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

কলকাতার বাবু ধনী চূড়ামণির সঙ্গে অপর বাবু রাজা নবকৃষ্ণদেবের রেষারেষি ছিল। নবকৃষ্ণ খুবই ধর্মভীরু লোক ছিলেন। এহেন নবকৃষ্ণ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মারা যান। সে সময়ে গঙ্গার জলে কোমর অবধি ডুবিয়ে ব্রহ্মনাম জপ করতে করতে মৃত্যুই ভাগ্যবানের লক্ষণ বলে লোকে মনে করত। একে 'গঙ্গাজলি' বলা হত। পরে চূড়ামণি অসুস্থ হওয়ামাত্র একটি রূপোর চতুর্দোলায় চেপে গঙ্গাযাত্রা করেন। চতুর্দোলাটি পতাকা, তুলসীমালার ঝালর, নামাবলী দিয়ে সাজানো হয়। সঙ্গে বিরাট কীর্তন ও বাজনদারের দল, চতুর্দোলার ওপর চূড়ামণি লালরঙের চেলী পরে, পিঠে নামাবলী চাপিয়ে, মাথায় শালগ্রাম

শিলা বসিয়ে, সারা গায়ে হরিনাম ছাপ দিয়ে, হাতে জপমালা নিয়ে, পাশে তুলসী-গাছ রেখে জপ করতে করতে 'গঙ্গাযাত্রা'র উদ্দেশ্যে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হন। নবকৃষ্ণের বাড়ীর সামনে গিয়ে চূড়ামণির ঐ বিশাল শোভাযাত্রা নাচতে নাচতে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে চীৎকার করে গাইতে থাকে :

'আয়রে আয় নগরবাসী দেখবি যদি আয়,
জগৎ জিনে চূড়ো এবার যম জিনতে যায়॥
যম জিনতে যায়রে চূড়ো যম জিনতে যায়,
জপ তপ যতই কর মরতে জানলে হয়॥'

উদ্দেশ্য হল নবকৃষ্ণ পরিবারকে দেখানো যে চূড়ামণিই শ্রেষ্ঠ।

শান্তিপুরের আর এক রসিক অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখার উল্লেখ করতে হয়। তিনি ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন। ডাক্তারদের প্রতি ব্যঙ্গই তাঁর মজার গানে প্রাধান্য পেয়েছে—

'ভাল ব্যবসা দিলি মা ডাক্তারী।
লাগে তীর না হয় 'তুক' বলে
আঁধারের গায়ে ঢিল মারি।
রোগ নিরূপণ ভারী ফলে কানা
পথ্যের মধ্যে জানি সাবুদানা,
রোগের নিদান না জেনে বিধান করি মা
এ যে দায় বড় ঝক্‌মারি॥
রোগী ধরে আমি করি টানাটানি
কড়ায় গণ্ডায় ভাল বুঝে নিতে জানি
গেরস্থ হয় দিগ্‌দারী তাতে
আমার ত' হয় ট্যাঁক ভারী॥'

সবশেষে শান্তিপুরের সঙ্‌-এর বিষয়ে কিছু বলা দরকার। সাধারণতঃ রাসের সময়ে বড় বড় বিগ্রহের সঙ্গে এসব সঙ্‌ বের হয়। এর মধ্যে পৌরাণিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী—সব রকমের সঙ্‌ই থাকে। এগুলি খুবই উপভোগ্য হয়। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় বিহারের সঙ্গে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব আনেন। ঐ সময়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। রাসের সময়ে একটি সঙ্‌-এ দেখা গেল—বিধান রায় রাধা সেজে বসে আছেন। আর তাঁর কোলে মাথা রেখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ কৃষ্ণরূপে শুয়ে। সঙ্গে লেখা আছে—'রাই (রায়) কৃষ্ণ মিলন'।

# শাশ্বত শান্তিপুর

শান্তিপুরের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাচর্চা শান্তিপুরকে বাংলার সারস্বত সমাজে অনন্য করে রেখেছে। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃত অনুশীলনের পীঠস্থান হিসাবে নবদ্বীপের সঙ্গে একত্রে শান্তিপুরের নাম আজও উচ্চারিত হয়। এখানকার সর্বানন্দী, চৈতল, নপাড়ি, শোভাকর, বল্লভী, কাশ্যপ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বংশে কত যে পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর এইসব পণ্ডিতরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভাস্বর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, কোম্পানী তাঁদের নিজস্ব কোষাগার থেকে শান্তিপুরের পাচজন পণ্ডিতকে নিয়মিত 'নগদ বৃত্তি' দিতেন। এঁরা হলেন: (১) রামনারায়ণ বাচস্পতি, (২) কাশীনাথ ন্যায়ালঙ্কার, (৩) রামজয় শর্মা, (৪) বিষেণচাঁদ শর্মা ও (৫) রামনিধি শর্মা। নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণও ১০৯৯ ও ১১০৮ সনে রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ভূমিদান করেন।

শান্তিপুরের পণ্ডিতদের এইরকম শাস্ত্রচর্চা কতদিন ধরে চলছে তা জানা যায়না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নিজে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য টোল বা চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। তাঁর সময়ে শান্তিপুরে আনুমানিক ৫০টি টোল ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শান্তিপুরের টোল সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০শে। বিশপ হেবর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রিপোর্টেও শান্তিপুরে ৩০টি টোলের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আর এই সময়ে অন্ততঃ ১০ জন পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় যাঁরা পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতনামা ছিলেন: তারিণী তর্করত্ন, কালিদাস বিদ্যাবাগীশ, রামদাস তর্কালঙ্কার, শ্রীরাম বিদ্যাবাগীশ, হরপ্রসাদ তর্কবাগীশ, রামনৃসিংহ শিরোমণি, কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত, বৈকুণ্ঠ নাথ ন্যায়রত্ন, ভুবন মোহন তর্কালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চতুষ্পাঠী অর্থে সেই টোল যেখানে চারশাস্ত্র পড়ানো হয়। ষড়্ দর্শনের মধ্যে যাঁরা দুটি দর্শনে পণ্ডিত তাঁরা 'মিশ্র', তিন, চার বা পাঁচ দর্শনের পণ্ডিতরা 'চক্রবর্তী', আবার কেউ 'সার্বভৌম' এবং সর্বদর্শনের অধ্যাপকরা 'ভট্টাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হতেন।

কালিদাস বিদ্যাবাগীশের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমাজসেবী রামনাথ তর্করত্ন। রামনাথের জন্ম ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। তিনি কলকাতার বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যাকেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ভ্রাম্যমান পণ্ডিত হিসাবে ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছর কাজ করেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করা। শুধু সংগ্রহই নয়, তার যাথার্থ্য নিরূপণও তাঁর দায়িত্ব ছিল।

১৮৮৫ সালে তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য 'বাসুদেব বিজয়ম্' প্রকাশিত হয়। এই

কাব্যের ছন্দোমাধুর্য বিচার করে তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহ তাঁকে কালিদাস পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে বর্ণনা করেন। এমনকি বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলর তাঁর অক্সফোর্ড-এর বাসস্থান ৭নং নরহাম গার্ডেনস থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করে পত্র পাঠান। 'বিলাপলহরী', 'আর্য্যালহরী' বা 'আর্য্যানবসতী', 'প্রভাত স্বপ্নম্' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেরও রচয়িতা তিনি। আবার "দেবী বিসর্জন" নামক মৌলিক গ্রন্থে তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জার্মান পণ্ডিত পল ডয়সন কলকাতায় এসে কলকাতার হাতিবাগানের পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্নের সঙ্গে 'মোক্ষ' নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ডয়সন রাজকুমারের উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় শান্তিপুর থেকে রামনাথকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। রামনাথের সঙ্গে আলোচনায় ডয়সন খুবই প্রীত হন এবং পরে শান্তিপুরে এসে রামনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সামাজিক সকল উন্নয়ন ও প্রগতিশীল কাজের সঙ্গে সর্বদা জড়িত ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরবাসীর পক্ষ থেকে বাংলার গর্ভনর উড্‌বার্ন সাহেবকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। উক্ত মানপত্রের সঙ্গে রামনাথের উদ্যোগে এক আবেদন-পত্র সংযোজন করা হয়। ঐ পত্রে শান্তিপুরের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ বিশেষভাবে তন্তু ও অন্যান্য কারুশিল্পীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয় ও ঐ সব অভাব অভিযোগ দূরীকরণের দাবী জানানো হয়।

ঐ সময়ে রেল লাইন সম্প্রসারণের উদ্যোগ চলছিল। শান্তিপুরের দাবী উপেক্ষা করে উলা বা বীরনগরের অধিবাসীরা রেল লাইন তাঁদের এলাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। রামনাথ যুক্তি ও তর্কজালে রেলের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের বশীভূত করেন। তাঁরা রেল লাইন শান্তিপুর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাথার্থ্য স্বীকার করেন এবং রেল লাইন শান্তিপুর পর্যন্ত বসানোর ব্যবস্থা হয়। অনুরূপভাবে তিনি গঙ্গা ও জলঙ্গীর মধ্যে এক খাল কেটে উভয়ের সংযোগসাধনের জন্যও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহ বিরোধী ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এজন্য বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে এই সবের সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করেন। সেকালের একজন গ্রাম্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে এসব কাজ অকল্পনীয় ছিল। ভারতের তৎকালীন শাসক পঞ্চম জর্জ কলকাতায় এলে সমগ্র পণ্ডিত সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকেই সম্রাটকে আশীর্বাদ করবার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত রামনাথের মৃত্যু হয়।

আর এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। তিনি বহু-ভাষাবিদ্ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। সুদূর সাগর পারেও এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীন রাজা থিবো তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তখন রাধিকানাথের বয়স মাত্র কুড়ি বছর। ঐ বয়সেই তিনি রাজগুরুর দুর্লভ আসন গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস এঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : "বাঙালী ব্রাহ্মণের স্বাধীন বৌদ্ধরাজার নিকট হইতে 'রাজগুরু' উপাধিলাভ বোধহয় ইহাই প্রথম ও ইহাই শেষ।" রাজা থিবো তাঁকে স্বর্ণফলকে উৎকীর্ণ "শ্রীগোস্বামী পণ্ডিত রাজগুরু" এই উপাধিপত্র, স্বর্ণমুকুট ও সোনার যজ্ঞোপবীত উপহার দেন। তিনি বহু গ্রন্থেরও প্রণেতা। তার মধ্যে কৃষ্ণজ্ঞানোদ্দেশদীপিকা ও মানদাগীত চিন্তামণির টীকা, সর্বসম্বাদিনীর ব্যাখ্যা, সঙ্কল্পক্রমের ব্যাখ্যা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিত রামেশ্বর গোস্বামী একজন সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধিক দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'চক্রবর্তী' উপাধি পান। তাঁর চতুষ্পাঠী খুবই বিখ্যাত ছিল এবং আদর্শ চতুষ্পাঠী হিসাবে গণ্য হত। মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড়, কর্ণাট্ প্রভৃতি স্থান থেকে ছাত্রেরা তাঁর টোলে পড়তে আসত। শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্নও তিনি গ্রীক্, ল্যাটিন সহ অন্ততঃ সাতটি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি প্রধানতঃ বিভিন্ন শাস্ত্র ও বেদ অধ্যাপনায় বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন।

শান্তিপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেন রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য বিদ্যাবাচস্পতি। অসাধারণ জ্ঞানী, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ষড়্দর্শন বেত্তারূপে তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর মত নৈয়ায়িক সারা ভারতেই আর কেউ ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের টীকা, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভাগবততত্ত্বসার, সিদ্ধান্ত সংগ্রহ প্রভৃতি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। পণ্ডিত রাধামোহনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এমনভাবে সারাদেশে প্রচারিত হয় যে, রাজা রামমোহন রায় তাঁর নিজস্ব ধর্মমত প্রচলনের আগে শান্তিপুরে এসে রাধামোহনের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—যিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন—তিনিও শান্তিপুরে পণ্ডিত রাধামোহনের কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : "শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কোলব্রুকের বন্ধু ছিলেন।" কোলব্রুক হলেন ইংরেজ পণ্ডিত যিনি এদেশীয় শাস্ত্রসমূহের সংকলনকে ইংরেজিতে সংকলন ও অনুবাদ করেন। কলকাতার তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি উইলিয়াম জোন্স তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে এবং তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান দেখে তাঁকে কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের 'জজ পণ্ডিত' পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। সেকালের আদালতে দেশীয় নিয়ম-কানুন ও শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যার জন্য সরকার কিছু পদ সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে দেশীয় কর্মচারীদের পক্ষে ঐ পদই সর্বোচ্চ ছিল। এঁদের নাম ছিল 'নেটিভ ল' অফিসার'। কিন্তু সাধারণ্যে এঁরা 'জজ পণ্ডিত' নামে

খ্যাত ছিলেন। ব্রাহ্মণের সরকারের বা অপরের অধীনে কর্ম করাকে তিনি ভৃত্যবৃত্তি বলে মনে করায় ঐ পদ গ্রহণে তাঁর অসম্মতির কথা জানান। তাঁর টোলের খ্যাতিও সারা ভারতে ব্যাপ্ত ছিল। সুদূর কাশী, কোশল প্রভৃতি এলাকা থেকে ছাত্রেরা তাঁর টোলে পড়তে আসত। তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রভর্তির ব্যাপারে এক অদ্ভুত নিয়ম ছিল। তাঁর টোলের দরজাগুলি ছোট ছিল। কোন নবাগত ছাত্র প্রথম প্রবেশের সময়ে যদি ঐসব দরজায় তিনবার ঠোকা বা ধাক্কা খেতেন তাহলে তিনি তাঁকে তাঁর টোলে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করতেন না। কারণ তাঁর মতে ঐ ছাত্র অমনোযোগী। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাপণ্ডিত পদে বরণ করেন এবং নাটোরের রাজপরিবার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চতুষ্পাঠীর ও অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য বাংলার এই দুই জমিদার তাঁকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। যতদূর জানা যায় তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণদেব গোস্বামী শান্তিপুরের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত। তাঁর পরিবারের রামনাথ ন্যায়বাগীশ, ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার, হরিনারায়ণ ন্যায়শাস্ত্রী, প্রাণকৃষ্ণ তর্কবাচস্পতি, ধনকৃষ্ণ ন্যায়ালংকার প্রমুখদের টোল বিখ্যাত ছিল। প্রধানতঃ উড়িষ্যা থেকে ছাত্রেরা এখানে পড়তে আসতেন। এখন উড়িয়া গোস্বামী পাড়ার যেখানে দোলের ডালি ধরা হয় তার কাছে যে উঁচু ঢিবি ঐ গুলি তাঁদের টোলের ধ্বংসাবশেষ। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'শিরোমণি' উপাধি প্রদান করেন। পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতির পর শান্তিপুরে আর এত বড় পণ্ডিত জন্মান নি। বর্তমান মতিগঞ্জের কাছে তাঁর খুব বড় চতুষ্পাঠী ছিল। মণিপুর থেকে ছাত্রেরা সেখানে আসতেন। পণ্ডিত মদনগোপাল ভাগবতাচার্য ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও অসাধারণ বাগ্মী।

শান্তিপুরে অসংখ্য পণ্ডিত তাঁদের পাণ্ডিত্যের জন্য সর্বত্র পূজ্য ও আদৃত ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী, কন্দর্প সিদ্ধান্তবাগীশ, রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শিবরাম বাচস্পতি, গোকুলচাঁদ গোস্বামী, কালিপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, পদ্মলোচন গোস্বামী, রঘুরাম সার্বভৌম, হরিহর বিদ্যাবাগীশ, রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যার, রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, দেবীপ্রসাদ ন্যায়বাচস্পতি, কালিদাস নাথ, মদনগোপাল গোস্বামী, শিশুরাম দাস, বীরেশ্বর প্রামাণিক, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন প্রমুখ সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিদ্যাদানকে তাঁরা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। একজন পাণ্ডতের টোলের ছাত্রসংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তাঁর নিজের বাড়ীতে তাদের জায়গা হত

না। বর্তমান রথতলায় হাটখোলা গোস্বামীদের যে রথ আছে তার ছায়ায় বসে তিনি ছাত্রদের পড়াতেন।

সংস্কৃত 'কোকিলদূতম' গ্রন্থের প্রণেতা হরিমোহন প্রামাণিক গ্রীকভাষায় লিখিত বাইবেলও পড়তেন আবার মূল বাইবেল পড়বার উদ্দেশ্যে হিব্রুভাষা শিক্ষার জন্য খ্রীষ্টান পাদরীর কাছেও যেতেন। তাঁর 'ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ' তাঁকে বাংলার সুধীসমাজের কাছে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ছিলেন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী। এঁর 'সম্বন্ধ নির্ণয়' এক বিশাল গ্রন্থ। এতে বাঙালী হিন্দুর সম্পূর্ণ জাতিগত বিন্যাস ও অতীত বর্ণনা করা হয়েছে। এঁর গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ামাত্রই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন, "এই গ্রন্থখানি ইউরোপে প্রকাশিত হইলে একটি কোলাহল বাধিয়া উঠিত, বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বহু প্রশংসা পড়িয়া যাইত এবং অন্ততঃ বহুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা পুস্তকে দুর্লভ, বাঙ্গলা লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করেনা।"

মনস্বীপুরুষ হরিশচন্দ্র ভাগবতভূষণ ছিলেন এক সত্যকারের প্রতিভাধর পণ্ডিত। তিনি আঠারো হাজার শ্লোকে চৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থ রচনার এক পরিকল্পনা করেন। তার প্রায় দশ হাজার শ্লোক তিনি রচনাও করেছিলেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম। নেপাল ও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজারা তাঁকে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

বহু ভাষাবিদ্, আইনজীবি ও শিক্ষাব্রতী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সত্যকারের জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখের সহপাঠী ও সাথী ললিতমোহন বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দি, ফরাসি, ল্যাটিন প্রমুখ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে 'মৃন্ময়ী' উপন্যাস রচনা করে তিনি সাহিত্য সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপসংহার বলে খ্যাত। এই বইয়ের ভূমিকায় দামোদর মুখোপাধ্যায় লেখেন: "আমি···অপর কোন শ্রদ্ধেয় লেখকের ভাব এই গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করি নাই।···বঙ্গীয় কাব্য-লেখক-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রসময় লেখনী-প্রসূত সুবিখ্যাত পুস্তক 'কপালকুণ্ডলা'কে এতদ্দ্বারা হয়ত বিকৃত-দশাপন্ন করিলাম ভাবিয়া···আমি সঙ্কুচিত হইতেছি।···এই আমার প্রথম উদ্যম। নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলে ইহাই আমার শেষ উদ্যম হইবে।" কিন্তু তাঁর

আশংকা বাস্তবে পরিণত হয়নি। তিনি প্রায় চল্লিশ খানা বই লেখেন। তার মধ্যে 'আয়েসা' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের উপসংহার এবং 'নবাবনন্দিনী' নামে দুর্গেশনন্দিনীর অনুসরণে একখানি উপন্যাস বিখ্যাত। দ্বিতীয়-খানি সম্পর্কে দামোদর মন্তব্য করেছেন : "দুর্গেশনন্দিনী'-বর্ণিত ইতিহাসের পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ব্যাপার এই গ্রন্থে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই জন্যই 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুসরণ নামে অভিহিত হইল।" আর একখানি গ্রন্থ "শুক্লবসনা সুন্দরী" ইংরেজ লেখক উইল্কি কলিন্স-এর এক ইংরেজি গ্রন্থের ৩ খণ্ডে কৃত অনুবাদ। এই বইটি অনুবাদের আগে দামোদর কলিন্সের কাছে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলে কলিন্স অনুমতি দেওয়ার সময়ে বলেন "আমার বইয়ের বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রস্তাবটি শুনে আমার মনে হল আমার সাহিত্যিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি আজ পেলাম।" 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' নামে মোট ৩২৭৮ পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থে তিনি ভাগবতের মূল ও ব্যাখ্যা বহুবিধ টিপ্পনী সহ তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকতার দিক থেকে দামোদরের অবদান স্মরণীয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে 'প্রবাহ', 'অনুসন্ধান', 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি সাময়িকপত্র এবং 'নিউজ অব্ দি ডে' নামে ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদকীয় ছিল স্বাধীন ও স্পষ্টবাদী। 'প্রবাহ' পত্রিকা প্রকাশের সময়ে তিনি ঘোষণা করেন : "প্রবাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিবে না।...সম্প্রদায় বিশেষের, মত বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের দাস হইবে না। প্রবাহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে।...যে সকল রাজকার্য্যের সহিত সর্ব্বসাধারণের ইষ্টনিষ্টের অধিক সম্বন্ধ দেখিবে, প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে।"

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে।

রবীন্দ্র-বৃত্তের সর্বপ্রধান কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় কলেজে পাঠকালে বিংশ শতাব্দী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'সিন্ধুতটে' প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে এলে কলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে তাঁকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাতে কিশোর করুণানিধান স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

ছাত্রজীবন শেষ করে করুণানিধান শান্তিপুরে এসে তাঁর নিজের স্কুল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে তাঁর 'বর্ষার তন্তুবায়' ছাপা হয় শান্তিপুরেরই কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'লহরী' পত্রিকায়। এরপর বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করতে থাকেন। আর সেই সুবাদে সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। অক্ষয়কুমার বড়াল, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখেরা তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। দেওঘরে মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে

পরিচয় ঘটে। এই সময়ে তাঁর কাব্য প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর 'প্রসাদী' কাব্যগ্রন্থ ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এর আগে 'বঙ্গমঙ্গল' ( ১৩০৮ ) প্রকাশিত হয়! এই 'প্রসাদী' কাব্যগ্রন্থ তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সসম্মানে বাংলার কবিসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে রবীন্দ্র পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তার মধ্যমণি হলেন করুণানিধান। ইতিমধ্যে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তাঁর 'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থ বের হয়। প্রখ্যাত সমালোচক ও 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে এর প্রশংসা-সূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। ফলে বাংলার এক প্রধান কবিরূপে তিনি চিহ্নিত হলেন।

এরপর তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে খুবই সাগ্রহে গৃহীত হয়। শান্তিজল ( ১৩২০ ), ধানদূর্বা ( ১৩২৮ ), শতনরী ( ১৩৩৭ ), রবীন্দ্র-আরতি ( ১৩৪৪ ) প্রমুখ কাব্যগ্রন্থ বের হতে থাকে। ইতিমধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি করুণানিধানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করেন। আশুতোষের এই আনুকূল্য কবি কোনদিন ভোলেন নি এবং আশুতোষের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ আমৃত্যু ছিল। তারই প্রতিফলন ঘটে আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর একটি বেদনা গীতির মধ্যে—'জাগিল ঝঞ্চা কাল-বৈশাখী, বাঙ্গালা অন্ধকার।'

কবির ৭৩ বৎসর পদার্পণ উপলক্ষে ১৩৫৭ সালের ৭ই মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি মানপত্র ও আড়াই শ' টাকার তোড়া দিয়ে বলা হয়: 'হে কবি, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও তোমার চিত্তের স্নেহরসে কাব্য-বর্তিকাকে তুমি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছ, তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াও তোমার সারস্বত সাধনা অমলিন আছে, প্রাত্যহিক অভাব অনটনের তিক্ততা তোমার মনের উদারতা ও প্রেমকে খণ্ডিত করিতে পারে নাই।' কবি প্রত্যুত্তরে সজলনয়নে বলেন যে, সকলে যেন আনন্দে থাকেন।

আজীবন দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যেও তাঁর অপূর্ব সাধনায় বাংলার কাব্য জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ১৩৬১ সালের ২৩শে মাঘ করুণানিধান পরলোক-গমন করেন।

শান্তিপুরের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এইরকম অসংখ্য জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতদের শিক্ষা ও দীক্ষায়। এঁদের মনীষা, মননশীলতা ও সারস্বত সাধনা দিয়ে তৈরী হয়েছে শাশ্বত শান্তিপুর।

# শান্তিপুরের কিছু স্থান-নাম

অন্যান্য স্থানের মত শান্তিপুরের বিভিন্ন এলাকার নামকরণে একটি পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে। কোন সম্প্রদায় গোষ্ঠীর একত্রিত বাস করার এলাকা সাধারণতঃ ঐ সম্প্রদায়ের নামেই নামাঙ্কিত হয়েছে। তেমন, কাঁসারী পাড়া, তিলিপাড়া, কারিকর পাড়া ইত্যাদি। অর্থাৎ কাঁসারী, তিলি বা কারিকররা ঐ সব এলাকায় দলবদ্ধভাবে বাস করত। কিন্তু শান্তিপুরে কোন বামুন পাড়া নেই। আসলে শান্তিপুরের ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাঁরা উপসম্প্রদায় হিসাবে সারা শান্তি-পুরের বিভিন্ন এলাকায় বাস আরম্ভ করেন। তাই ব্রাহ্মণের উপ-সম্প্রদায় সমন্বিত এলাকা ঐ সব উপ-সম্প্রদায়ের নামে চিহ্নিত হয়েছে। তেমন কাশ্যপ পাড়া, বল্লভী আচার্য পাড়া, নপাড়ি পাড়া, সর্বানন্দী পাড়া, চৈতল পাড়া প্রভৃতি। এগুলি ব্রাহ্মণদের উপ-বিভাগ। অপরদিকে বেজপাড়া হল বৈদ্যপাড়া থেকে সৃষ্ট। এই এলাকায় একসময়ে শান্তিপুরের প্রধান প্রধান বৈদ্যরা তাঁদের আরোগ্যশালা খোলেন। হয়ত বা কাছাকাছি জায়গায় গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত খালের জলের মুক্ত আবহাওয়া রোগীদের পক্ষে শ্রেয়তর হওয়ায় তাঁরা তাঁদের আবাসস্থল এখানেই গড়ে তোলেন।

শান্তিপুরে ডাঙ্গা যুক্ত অনেক জায়গার নাম পাওয়া যায় যেমন—তিলডাঙ্গা। অর্থাৎ যে এলাকায় কৃষিজ পণ্য তিল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হত সেই জায়গাটি হয়েছে তিলডাঙ্গা। অনুরূপভাবে যেখানে মেথি উৎপন্ন বেশী হত সে জায়গা মেথির ডাঙ্গা নামে খ্যাত। কিন্তু বেলেডাঙ্গা নাম হয় ওখানে বালির আধিক্য বলে। তবে ভোলাভাঙ্গা বা টেংরিডাঙ্গা নামের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়না। ভোলা নামক শিব অথবা ব্যক্তি বিশেষের জন্য অথবা ভোলা মাছ ও ট্যাংরা মাছের আধিক্য অনুযায়ী এইসব জায়গার নাম হয়েছে বলে স্থির করা খুবই কষ্ট-কল্পনা। অপরদিকে খাপরাডাঙ্গা নাম হয়েছে এক পুরানো স্মৃতিকে ঘিরে। একসময়ে শান্তিপুরে দোলো চিনি তৈরী হত। তার কাঁচামাল ছিল খেজুর গুড়। নাগরী ভাঙা টুকরো বা খাপরা দিয়ে যে রাস্তা হল তা ক্রমশঃ খাপরাডাঙ্গা হিসাবে পরিচিত হল। আর সাহেবডাঙ্গা নাম থেকেই বোঝা যায় সাহেবদের বাসস্থান বা দখলীকৃত এলাকা। একসময়ে শান্তিপুরে ইংরেজ কুঠির খুবই বাড়বাড়ন্ত ছিল। প্রচুর ইউরোপীয় এখানে থাকতেন কুঠির কাজ বা ব্যবসার স্বার্থে। তাঁরা স্বাভাবিক কারণে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতেন যে এলাকায় সেইটি তার সন্নিহিত এলাকাসহ সাহেবডাঙ্গা নামে পরিচিত হল। সূত্রাগড় এলাকার ষড়ভুজ বাজার বা পাড়ায় কোন ষড়ভুজ মূর্তি নেই। কিন্তু একসময়ে ছিল। বর্তমানে মূর্তিটি বড় গোস্বামী বাড়ীতে রয়েছেন।

তবুও তাঁরই স্মরণে এই নাম। অনুরূপভাবে বর্তমান বিগ্রহমূর্তি শ্যামচাঁদ, পাগলা গোস্বামী বা মদনগোপালের নামে ঐসব পল্লী পরিচিত। আবার বিরাটকায় মাটির নাড়ুগোপাল মূর্তি তৈরী ও পূজিত হয় বলে সেই এলাকার নাম গোপালপুর। অপরদিকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বাজার বা গঞ্জের জন্যও সেই বাজার সেই ব্যক্তির নামে পরিচিত হতে দেখা যায়। যেমন মতিগঞ্জ। জমিদার মতি রায় মেয়েদের বাজার করার জন্য এই গঞ্জ বা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

গাছের আধিক্য দিয়েও অনেকপল্লীর নাম হয়েছে। যেমন, আতাবুনিয়া, বাঁশবুনিয়া। অর্থাৎ ঐ সব এলাকায় আতা বা বাঁশগাছ বেশী ছিল। অবশ্য ঐ এলাকার বিগ্রহমূর্তিও ঐসব নামে খ্যাত। কিন্তু কদবেলতলা, আমড়াতলা, লেবুতলা হল পল্লীর নাম। আবার পীরতলা হল পীরের মাজারের সম্মানে। মজার ব্যাপার হল লক্ষ্মীতলা নামে। এখানে কোন লক্ষ্মীর মন্দির নেই। কিংবা কোন বারোয়ারী ভাবে লক্ষ্মীপূজার কথা সে সময়ে কেউই চিন্তা করত না। তবুও লক্ষ্মীতলা নাম। আসলে ঐ এলাকার আশেপাশে প্রচুর কৃষি জমি থাকায় ঐ সব জায়গার উৎপন্ন ফসল ঐ এলাকায় সঞ্চিত হত। আর ইংরেজ কুঠি কাছে থাকায় কাঁচা পয়সারও সুবিধা ছিল। স্বভাবতঃই ঐ এলাকায় লক্ষ্মীর বাস বলে ধরে নিয়ে নাম হয়ে গেল লক্ষ্মীতলা। কুঠির পাড়া নাম থেকেই বোঝা যায় যে, ঐ এলাকার তাঁতীদের সঙ্গে ইংরেজ কুঠির ব্যবসায়িক যোগ ছিল। মোটামুটিভাবে ঐ এলাকার সকল তাঁতীই ইংরেজ কুঠিতে মাল দিতে বাধ্য থাকতেন। তাই সাধারণ্যে ঐ পাড়াই কুঠির পাড়া হয়ে গেল।

একজন ব্যক্তির একক কীর্তিতে সমগ্র পাড়া পরিচিত হয়েছে এমন পাড়া হল আশানন্দ পাড়া। আশানন্দ মুখোপাধ্যায় একবার ঢেঁকির সাহায্যে একদল ডাকাতকে তাড়াতে সক্ষম হওয়ায় তাঁর বীরত্বের জন্য আশানন্দ ঢেঁকি নামে খ্যাত হন। তাঁর কীর্তির আলোকে সমগ্র এলাকাটিই পবিচিত হল তাঁর নামে। আবার স্বীয় কীর্তির চেয়ে নিজের বিশাল বাড়ীর জন্য একটি মোড়ের মাথার নামই হয়েছে নেড়া সান্যালের মোড়।

হাটখোলা পাড়া নাম থেকেই বোঝা যায় যে, একসময়ে ওখানে বাজার বা হাট ছিল। নদীতে অর্থাৎ গঙ্গার খালে মাল বহনের সুবিধা থাকায় বাজার এই জায়গায় জমে ওঠে। রথতলা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এখন বাজার সরে গেলেও হাটখোলা নামটি অপরিবর্তিত আছে।

বাইগাছি হল বাবুইগাছির অপভ্রংশ মাত্র। এই বিরাট এলাকা একসময় ছিল অপেক্ষাকৃত জনবিরল বিশাল বিশাল গাছ সমন্বিত জায়গা। আর ঐ সব গাছে বাবুই পাখীরা সুখে বাসা বাঁধত। তাই এই নাম। আর তার পাশেই তুলনামূলক ভাবে শান্ত ও বিত্তশালী এলাকা পরিচিত হয়েছিল নিশ্চিন্তপুর নামে। ঐ জায়গাটি

চিন্তাহীন জীবন যাপনের আদর্শস্থান ছিল।

শান্তিপুর হল গঙ্গার বিভিন্ন খাত সমন্বিত এলাকা। ফলে বিভিন্ন জায়গায় জলাজমি একসময়ে প্রচুর ছিল। আর তাতে উৎপন্ন হত বড় বড় খড়। খড়জলা নামের জায়গা সেই তথ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখানকার গঙ্গার ধারের দুটি ঘাট শান্তিপুরের অতীত স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রথমটি হল স্টীমার ঘাট। কলকাতা থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত নিয়মিত স্টীমাব চলাচল করত এই ঘাট থেকে। আজ স্টীমার আর চলেনা। কিন্তু শান্তিপুর-বাসী নামটি স্মরণ করে চলেছেন সযত্নে। অপরটি হল বক্তার ঘাট। কথিত আছে বক্তিয়ার খিলজী এই ঘাট পার হয়ে কালনা দিয়ে নবদ্বীপ আক্রমণ করে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেন কে পরাজিত করেন। তিনি ১৭ জন বা তার বেশী সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক থাকলেও তাঁর এই পথ দিয়ে ঘাট পার হওয়া অস্বীকার করা যায়না। বক্তার ঘাট নামটি তারই স্মৃতিতে। এই ঘাট থেকে বেশ একটু দূরে ঘোড়ালিয়া নামক জায়গা প্রমাণ করে যে বখতিয়ার নবদ্বীপ যাওয়ার আগে তাঁর ঘোড়সওয়ারদের অপরের দৃষ্টির অগোচরে রেখেছিলেন। বক্তার ঘাট ও ঘোড়ালিয়া বখ্‌তিয়ার খিলজীর স্মৃতি বহন করছে।

# পরিচিত শান্তিপুর

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমায় শান্তিপুর থানা। ২৩° ১৪' ২৪" উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° ২৯' ৬" দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। শান্তিপুর থানা এলাকার আয়তন ১১৯ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী শান্তিপুর থানা এলাকার লোকসংখ্যা হল ২,৪৭,৭৪৯ জন। শান্তিপুর থানার মধ্যেই অবস্থিত শান্তিপুর শহর। মোটামুটিভাবে এই শহর এলাকাকে ঘিরে শান্তিপুর পুরসভা। এর আয়তন ২৫ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ১, ০৯, ৯১১ জন। পুরসভা ব্যতীত শান্তিপুর থানার অধীনে ১০টি অঞ্চল আছে। এগুলি হল: গয়েশপুর, বাগাঁচড়া, হরিপুর, আরবান্দী ১নং, আরবান্দী ২নং, বেলগড়িয়া ১নং, বেলগড়িয়া ২নং, বাবলা, নবলা ও ফুলিয়া।

'শান্তিপুর' নামকরণ কেন হল বা কখন হল তা জানা যায় না। এক হাজার বছর আগেও এ নাম প্রচলিত ছিল। তবে ঐ সময়ে বর্তমান শান্তিপুর এলাকা ছিল বলে মনে হয়না। কোনো কোনো মতে শান্তমণি, শান্তাপণ বা শান্তাচার্য নামে একজন মুনি বা সিদ্ধপুরুষের নাম থেকে এই নাম হয়েছে। আবার কারও কারও মতে এখানকার জনগণ শান্তিপ্রিয় ও এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য বাইরের লোকজন এখানে শান্তিতে বসবাস করতে আসতেন বলে এই জায়গা শান্তিপুর নামে খ্যাত হয়েছে। তবে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নররা এখানে হাওয়া পরিবর্তন করতে আসতেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন যে "শান্তিপুরের দক্ষিণদিক থেকে গঙ্গার যা শোভা তার তুলনা নেই।"

ভাগীরথীর পলিমাটির ওপর শান্তিপুর গঠিত। তাই এখানকার মাটি সমতল ও নরম। ভূ-প্রকৃতির কোথাও উঁচু নীচু বা কাঁকর মাটি দেখা যায় না। জমিতে সাধারণভাবে বালির পরিমাণ বেশী। এই কারণে কাঁটা জাতীয় কন্টিকারী, কাঁটা-নটে, খেজুর, বৈঁচি, বাবলা ইত্যাদি গাছের বৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এদের শিকড় খুবই শক্ত হয় ও মাটিকে ধরে রাখে। শান্তিপুরে কোন খনিজ পদার্থ নেই। এখানকার কোনো কোনো জলাশয়ের জলে কেরোসিন তেলের গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে তেল ভাসতেও দেখা যায়। গঙ্গা বেসিন বা গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে তেল আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এবং যার জন্য ভারতীয় তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের উদ্যোগে যে খনন কার্য মাঝে মাঝে চালানো হয় এটি তারই কারণ বলে মনে হয়।

শান্তিপুরে কোনো বৃহদায়তন শিল্প নেই। তবে শান্তিপুরের অধিবাসীদের

উদ্যোগে অনেক বৃহৎ শিল্পের সূচনা বা পরিকল্পনা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে মহাভারত দে পোদ্দার কলকাতা থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত জাহাজ চলাচল ব্যবসায়ে উদ্যোগী ছিলেন। প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় স্বয়ং বৃহৎ লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সুবৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত কারখানার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শান্তিপুরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় যে, তাদের আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্য শান্তিপুরের অধিবাসীরা বর্ধমানের কালনা থেকে হুগলীর মগরা পর্যন্ত একটি শাখা রেল লাইন স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করবে।

তবে কুটির শিল্পের জন্য শান্তিপুর বিখ্যাত। যে তাঁতের কাপড় এখানকার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে তাও ঐ কুটির শিল্পই। শুধু কাপড়ই নয়—কাপড়ের নামগুলিও বিচিত্র। যেমন, সর্বসুন্দরী, খড়কেমুঠি, সিঁদুরী, চৌরঙ্গী, তাসখুপী, আয়নাসুন্দরী ইত্যাদি। এখন যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের নাম বদলে গিয়েছে। কাপড়ের সূক্ষ্মতা শুধু সুতার ওপরই নির্ভর করেনা—বয়নকারীর হস্তনৈপুণ্যও এর পেছনে কাজ করে। বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত শিক্ষাই এইসব বয়ন-শিল্পীকে কুশলী করে তুলেছে।

শান্তিপুরী কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও সেই সঙ্গে কাপড়ের পাড়ের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এদেরকে আকর্ষণীয় ও চিত্তগ্রাহী করেছে। পুরানো আমলের এইসব বৈচিত্র্যময় কাপড়ের পাড়ের নামগুলিও বৈচিত্র্যময়। যথা: চাঁদমালা, তাজ, তাজ কল্কা, কল্কা, চৌকল্কা, ভোমরা, ফুলঝুমকা, লতা ফুল পাখী, পারিজাত ফুল, ঢাকাই ফুল, কার্ণিশ, টেক্কা ( চাররকম ), এড়ো ও সোজা টেক্কা ( এগুলিও চাররকম ), চৌটেক্কা, চাঁদ, রাজমহল, দোরোকা ( অর্থাৎ পাড়ের দুপিঠে দুটি ভিন্ন রঙে একই ছবি ), কাণাডুমরী, গগন, আঁশ, মাছ, মানুষ, হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি। আগে এইসব পাড়ের ছবি হাতে সূচের সাহায্যে তুলতে হত। পরে ডাভিতে নানারকম রঙিন সুতা, জড়ি, রেশম ইত্যাদির সাহায্যে বোনা আরম্ভ হয়।

এককালে যেসব তাঁতী প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে কিশোরী লাল প্রামাণিক, বামাচরণ প্রামাণিক, রামচন্দ্র দালাল, মথুরা মোহন প্রামাণিক, ব্রজমোহন প্রামাণিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিশোরীলাল পাড়ে নানাভাষায় নাম, গানের কলি ইতাদি বুনতেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি একটি রুমালের চারিধারে ইংরেজি ও সংস্কৃতে বাইবেলের বাণী বুনে পাঠান। তিনি 'কলাবতী' নামে এক অতি মূল্যবান পাড়বিশিষ্ট কাপড় বুনতেন। পাড়ে কোনো সুতা থাকত না। পাড়ের একপিঠে সোনালী আর অপরপিঠে রূপালী জড়ি দিয়ে এ কাপড় বোনা হত। তাঁর কাপড়ের পাড়ের নকশা দেখে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ

ফিয়ার নকল করে বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ে নকশা পাড় শুরু হয়। তার আগে ম্যাঞ্চেষ্টারে এক রঙা পাড় হত। চন্দ্রকান্ত ও নিতাইচাঁদ প্রামাণিক পাড়ের নকশা কাটায় ওস্তাদ ছিলেন। কাশিমবাজার, কৃষ্ণনগর প্রভৃতির রাজারা নিতাইচাঁদের নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন। হাজারীলাল প্রামাণিক কাপড় ইত্যাদির পাড়ে বিভিন্ন ধরণের নাম, গান, ছবি ইত্যাদি তুলতে দক্ষহস্ত ছিলেন। একবার তাঁর গায়ের চাদরের পাড়ে তাঁরই বোনা 'যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী' এই গানটি দেখে জনৈক ইংরেজ ব্যবসাদার পাড়টি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, আগে কিন্তু শান্তিপুরের কাপড়ের পাড় একরঙাই বোনা হত। প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে কটক থেকে একজন তাঁতী এখানে আসার পর এখানে প্রথম নকশা পাড় কাপড় বোনা শুরু হয়।

তাঁত শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল কাপড় কাচা, শাল, আলোয়ান ইত্যাদি ধোয়া ও রিপু করা শিল্প। বিশেষভাবে তাঁতের কাপড় বিশেষভাবে ধুয়ে সাদা করা—যাকে শাঁখ পেটাই বলা হত—একমাত্র শান্তিপুরেই হত। অতিসূক্ষ্ম সূঁচের সাহায্যে যে কোন ছেঁড়া শাল, কাপড় ইত্যাদি এমন নিখুঁত ভাবে রিপু বা বা মেরামত করা হয় যা সাধারণ চোখে বোঝাই যায় না। সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমানরাই এই অতি সূক্ষ্ম শিল্পটিকে আজও অব্যাহত রেখেছেন। একসময়ে শান্তিপুরের মেয়েরা কাপড়ের পাড়ে ফুল তুলতেন। কিন্তু কলে এবং তাঁতে নকশা পাড় চালুর পর এই শিল্প থেমে গিয়েছে। অথচ শান্তিপুরের মেয়েদের এই শিল্প বাংলার বাইরেও খুবই আগ্রহের সঙ্গে আদৃত হত।

এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের মহিলাদের সম্পর্কে একটি মন্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ভোলানাথ চন্দ্র সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ করে তাঁর ২ খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থ 'ট্র্যাভেলস অব্ এ হিন্দু' লেখেন। তাতে তিনি শান্তিপুর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর ভ্রমণের অঙ্গ হিসাবে শান্তিপুরে আসেন। তার মধ্যে একজায়গায় শান্তিপুরের মেয়েদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—শান্তিপুরে মহিলাগণের লঘু, সুশ্রী, সুগঠিত ও কমনীয় দেহঠাম এবং মসৃন ও কোমল অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে মনে হয় যেন এই হল বাংলার নিজস্ব সৌন্দর্য। তাদের মোহিনী বাক্‌পটুতা ও উচ্ছ্বসিত রসিকতার জন্য তারা বিখ্যাত। শুধু তাই নয়। তিনি তাদের চুলের খোঁপা বাঁধারও উচ্ছ্বসিত ও সপ্রশংস বর্ণনা করেছেন।

একসময়ে শান্তিপুরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল চিনি শিল্প। হয়ত' তারই আনুষঙ্গিক হিসাবে এখানে মিষ্টান্ন তৈরীর ও ব্যবহারের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা

বর্তমান। এখানকার মিষ্টান্নে চিনির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশী। অথচ শান্তিপুরের জনসাধারণ এই ধরণের অধিক চিনি সম্বলিত মিষ্টান্ন ছাড়া কলকাতা প্রভৃতি এলাকার কম চিনি দেওয়া মিষ্টি গ্রহণ করতে চাননা। অনেকরকম মিষ্টান্নের মধ্যে শান্তিপুরের একান্ত নিজস্ব ঘরানার মিষ্টান্ন হিসাবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় খাস্যমোয়ার নাম। ধান ও অন্যান্য নোংরা ও অব্যবহার্য দ্রব্য বাদ দিয়ে পরিষ্কার করা খই চিনির রসে জারিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তার সঙ্গে গাওয়া ঘি আর জাইফলের গুঁড়ো দিয়ে সেগুলিকে বড় মোয়ার আকারে বাঁধা হয়। এর স্বাদ অপূর্ব। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের ১২৭৯ সালের পৌষ সংখ্যায় একটি তুলনা প্রসঙ্গে লেখা হয় : "শান্তিপুরের খাসা খই / বর্ধমানের বসা দই, / বঁধু আমি তোমা বই / আর কারো নই।"

শান্তিপুরের অপর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিষ্টান্ন হল নিখুঁতি। এর নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই মিষ্টান্ন খুঁতহীন। জলবিহীন ছানার সঙ্গে অল্প চালের গুঁড়ো, পরিমাণমত ময়দা ও চিনি ভাল করে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তার সঙ্গে বড় এলাচের দানা দিয়ে মেখে সেই ছানাকে কাপড় ফুটো করে তার মধ্য দিয়ে চাপ দিয়ে ঘিয়ের কড়ায় ছাড়া হয়। তারপর ঘিয়ে ভাজা হয়ে গেলে সেগুলিকে রসে ভিজিয়ে রাখা হয়। এই নিঁখুতির স্বাদ অপূর্ব।

শান্তিপুরের আর দু'টি বিশিষ্ট মিষ্টান্ন হল ৪ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি আকারের জিবে গজা ও গুড়ের পক্কান্ন। অল্প ঘি ও কালো জিরে মিশিয়ে ময়দাকে খুব শক্ত করে মাখা হয়। তারপর ছোট ছোট লেচি করে জিবের আকারে সেগুলিকে বেলে তেলে ভাজা হয়। পরে চিনির রসে বীজ দিয়ে তার মধ্যে ঐ গজাগুলিকে ভালো করে ভেজানো হয়। রসে বীজ দেওয়ার ফলে ঐ চিনি গজার গায়ে জমে যায় এবং খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। অপরদিকে বেসমের কাঠি তেলে ভেজে গুড় জ্বাল দিয়ে তার মধ্যে ঐ কাঠিগুলিকে ভেজানো হয়। পরে গুড় জমে যাওয়ার মুখে গুড়মাখা কাঠিগুলিকে গোলাকার মণ্ডে পরিণত করা হয়। এই গজা ও পক্কান্ন একমাত্র শান্তিপুরেই হয়। পশু ময়রা, অমৃত ময়রা, বামুন ময়রা, অটল ময়রা ইত্যাদিরা দিকপাল মিষ্টান্ন প্রস্তুত কারক ছিলেন।

শান্তিপুরের মৃৎশিল্প সুপ্রাচীন। মূর্তি ইত্যাদি নির্মাণে এখানকার মৃৎশিল্পীদের খ্যাতি আছে। বিশেষভাবে মূর্তির মুখমণ্ডল ও অবয়বের সুঠাম গঠন সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। বর্তমানে শান্তিপুরের এক শিল্পী এক দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন। সেটি হল পোড়ামাটি বা টেরাকোটা শিল্প। প্রাচীন বাংলার মন্দিরগাত্রে যেভাবে টেরাকোটা শিল্প প্রকট ছিল বর্তমানে এই শিল্পী শ্রী কানাই দেউরী বিভিন্ন মন্দিরগাত্র তাঁর তৈরী টেরাকোটা দিয়ে সজ্জিত করছেন। আগে ইটের ওপরই টেরাকোটা তৈরী করা হত। শ্রী দেউরী তার পরিবর্তে পাটার মত টেরাকোটা

তৈরী করে সিমেণ্ট বা আঠা জাতীয় জিনিস দিয়ে প্রাচীর গাত্রে আটকিয়ে দিচ্ছেন। মাটিকে পরিষ্কার করে একটি রাসায়নিক পদার্থ তার সঙ্গে মিশিয়ে তিনি ঐ সব মূর্তি তৈরী করছেন। তাঁর প্রস্তুত এইসব টেরাকোটায় প্রাচীন মূর্তি, দেবদেবী, ফুলপাতা ইত্যাদির সঙ্গে আধুনিক মূর্তিও সংযোজিত করছেন। বিশেষভাবে অদ্বৈতাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আশানন্দ ঢেঁকি থেকে যোগাচার্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী প্রমুখ শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তাঁর টেরাকোটার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন।

সাংস্কৃতিক শান্তিপুর তার বিশিষ্ট পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছে। এখানকার কথ্য ভাষা বাংলার চলিত লেখ্য ভাষার আদর্শ হিসাবে গণ্য। লক্ষ করলে দেখা যায় প্রয়োজনমত মহাপ্রাণ বর্ণকে অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত করা, কথার মধ্যে প্রয়োজনমত 'গো' শব্দের প্রয়োগ এবং বিশেষ স্বরাঘাত শান্তিপুরের কথ্যভাষাকে এত মিষ্ট ও শ্রবণযোগ্য করে তুলেছে। সেইসঙ্গে শান্তিপুরের কিছু কিছু নিজস্ব বাক্য বা শব্দ আছে। সেগুলি খুবই আকর্ষণীয়। যেমন, ঝন্‌কাঠ ( দরজার চৌকাঠের নীচের কাঠ ), ঘসি ( ঘুঁটে ), আকা ( উনুন ). থুয়ে (রেখে ), ধাঁ করে ( চট্ করে ), কুলুপ ( তালা ), তরশু ( পরশুর পরের বা আগের দিন ), চোড়ে ( ছোটগামলা ), ব্যান ( বেয়ান ), ড্যাগরা ( দুষ্ট ছেলে ), আলপা>অলপ্পেয়ে ( অলক্ষ্মীপায় ) ইত্যাদি।

নদীয়া জেলার মধ্যে শান্তিপুরেই সর্বাধিক পুরানো আমলের মন্দির দেখা যায়। এর কারণ অবশ্যই অদ্বৈতাচার্যের উপস্থিতি। তাঁর বংশধরগণ ও শিষ্যেরা শান্তিপুরে এই সমস্ত মন্দির স্থাপন করেন। এই সঙ্গে মোগল আমলে শান্তিপুর বাদশাহের অন্যতম প্রধান সেনা কেন্দ্র হওয়ায় এখানে প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন মসজিদের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। এইসব প্রাচীন মন্দির মসজিদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম দেবালয়গুলির অন্যতম শ্যামচাঁদ মন্দির ( প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ ), সূক্ষ্ম ফুলকারী টেরাকোটা নকশা বিশিষ্ট জলেশ্বর মন্দির ( প্রতিষ্ঠাকাল অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ ) ও তোপখানা মসজিদ ( প্রতিষ্ঠাকাল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ায় প্রথম রেলপথ স্থাপন করা হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত যে রেলপথ স্থাপন করা হয় তা রাণাঘাটের ওপর দিয়ে যায়। তারপর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল রাণাঘাটের চূর্ণী নদীর অপরপারে আঁশতলা থেকে একটি ছোটলাইন বা ন্যারো গেজ রেলপথ বানানো হয়—আঁশতলা থেকে শান্তিপুর হয়ে দিগনগর হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত। এখনও হবিবপুরের পাশ দিয়ে ঐ রেলপথের উঁচু পথটি দেখা যায়। এটিকে সাধারণভাবে রাণাঘাট কৃষ্ণনগর ট্রামওয়ে বলা হত। পরে চূর্ণী নদীর ওপর ব্রীজ তৈরী হলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে আঁশতলা থেকে

শান্তিপুর পর্যন্ত ছোট রেল তুলে দিয়ে বড় লাইন বা ব্রডগেজ চালু করা হয়। আর শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে ছোট লাইনটি ছিল তা নবদ্বীপ পর্যন্ত চালানো হল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই বড় ও ছোট লাইনের রেলপথ শান্তিপুরকে যথাক্রমে রাণাঘাট ও নবদ্বীপের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে।

সব শেষে শান্তিপুর সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই প্রতিবেদনেই শান্তিপুরের প্রকৃত রূপ বা আদি সত্তা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক হিসাবে ঐতিহাসিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক মিঃ এ. পেড্‌লারের কাছে উপস্থাপিত করেন। তাতে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানের পুঁথির বিবরণ দিয়ে বলছেন : "সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে শান্তিপুরেই দেখলাম যে, পুঁথি রক্ষা করবার জন্য কি কঠোর পরিশ্রম, কি নিরলস প্রচেষ্টা শান্তিপুরের পণ্ডিতরা করছেন। প্রতিটি পুঁথির নীচে ও ওপরে কাঠের পাটাতন দিয়ে পরিষ্কার লাল কাপড়ে বেঁধে রাখা হয়। নিয়মিত সব পুঁথি রৌদ্রে দেওয়া ও কীটধ্বংসকারী দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। এখানে অসংখ্য অক্ষত প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। তারমধ্যে ২২ খানি পুঁথি খুবই প্রাচীন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সব পুঁথিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথিটি অন্ততঃ পক্ষে ৬৭২ বছরের পুরানো ( ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে )।

---